তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো রামনারায়ণঃ স্বয়ম্॥"

—অর্থাৎ,—কোদালিয়া গ্রাম (দ্বিতীয়) কাশীপুরী এবং ঐ গ্রামের গোঘাটা নামক গঙ্গাঘাট মণিকর্ণিকাতীর্থ, এবং রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন সাক্ষাৎ বেদব্যাস।

তর্কপঞ্চাননের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ আমার পিতৃদেব কৃষ্ণমোহন শিরোমণি, মধ্যম মথুরামোহন, কনিষ্ঠ মধুসূদন। পিতৃদেব নগদ টাকায় ও বহুমূল্য দ্রব্যাদিতে কত উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা হয় না। কিন্তু তিনি একটী কপর্দ্দকও কখনও সঞ্চয় করেন নাই। আমার পিতামহের জীবদ্দশায় পিতৃদেবের সমস্ত উপার্জ্জনই পিতামহের হস্তগত হইত, পিতামহের স্বর্গারোহণের পর দুই পিতৃব্যের হস্তগত হইত। আমার পিতৃব্যদ্বয়, বিশেষতঃ কনিষ্ঠ পিতৃব্য বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। কিন্তু আমার পিতা, সোদর সর্ব্বনাশ করিলেও দ্বিরুক্তি করেন নাই। বলিতেন, আমার দুই সোদর আমার দুই বাহু, উহারাই আমার দেহ-মন-প্রাণের অর্দ্ধার্দ্ধ দুই ভাগ।

যখন আমার মেজো কাকিমা পিত্রালয় হইতে প্রথম আমাদের বাটী আসিলেন, তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, অঙ্গে ভূষণাদি ছিল না। আমার মাতৃদেবী নিজ অঙ্গে শুধু শাঁখা ও লোহামাত্র রাখিয়া, নিজের বহুমূল্য বসন-ভূষণ আমার মেজো কাকিমাকে পরাইয়া, তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। আমার পিতামহী আমার মাতাকে একটু তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—বৌমা! তুমি তোমার সকল গহনাই মেজো বৌমাকে দিলে? মা বলিলেন,—আমি কাহাকে দিলাম? আমরা উভয়ে কি ভিন্ন? সে পুণ্যময় সংসারের কথা বর্ণনা করিতে গেলে, একখানি বিশাল গ্রন্থ হইয়া পড়ে। হাঁড়ির দুই একটী ভাত টিপিয়া দেখিলেই যেমন সমস্ত ভাতের পাক বুঝা যায়, তেমনি দুই একটী ঘটনা দ্বারাই লোকের সমস্ত জীবনের প্রকৃতি বুঝা যায়।

মানুষ অধার্ম্মিক কিরূপে হয়, ইহা আমার পিতা বুঝিতে পারিতেন না। এজন্য সকলেরই উপর তাঁহার সরল বিশ্বাস। কেহ মিথ্যা দায় জানাইয়া তাঁহার নিকট অর্থ ভিক্ষা করিতেছে, এ কথা বুঝাইলেও বুঝিতেন না। কেহ তাঁহার প্রতি বা অন্যের প্রতি প্রত্যক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা করিলেও, তিনি তাহার সে কার্য্যেরও সদভিপ্রায় উদ্ভাবন করিতেন। তিনি সহসা ক্রুদ্ধ হইতেন না। তাঁহার প্রবল ক্রোধের কারণ প্রধানতঃ তিনটী ছিল;—(১) স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার। (২) শিশুর উপর প্রহারাদি নির্দ্দয়তা। (৩) পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা। সহসা ক্রুদ্ধ না হইলেও, যখন তাঁহার ক্রোধ হইত, তিনি অতিরুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন, প্রলয় উপস্থিত হইত। তৎক্ষণাৎ তাঁহার জননী দৌড়িয়া গিয়া,—"ও বাবা!—" বলিয়া ডাকিবামাত্র, মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় স্তব্ধ ও নিশ্চল হইয়া যাইতেন। নিমেষমধ্যেই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্ত! অনন্তর মাতৃকরস্পর্শ-

মাত্র বিহ্বল হইয়া মাতৃক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেন।

তিনি প্রবাস হইতে গৃহে আসিলে, মাতা-পুত্রে ক্ষণমাত্র ছাড়াছাড়ি হইত না। আমাদের বহির্বাটীতে অহোরাত্র অসংখ্য লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতে সকলেই লালায়িত। আমার পিতামহী তাঁহাকে কোলে আগুলিয়া বসিতেন। তিনি যখন যাহা বলিবেন, সমস্তই আমার পিতামহীর কর্ণগোচর হওয়া চাই। অথচ বুড়ীর শ্রবণশক্তি দুর্ব্বল। আমার পিতারও প্রতিজ্ঞা,—তাঁহার মাতা তাঁহাকে এক কথা সহস্রবার জিজ্ঞাসা করিলেও, অণুমাত্র বিরক্তি নাই। প্রতিবারেই তিনি সেই এক কথা সমান তেজে ও আগ্রহে বলিতেন। ইহাতে আর সকলে বিরক্ত হইত। কিন্তু তাঁহার পিতা-মাতার বিষয়ে বিরক্তি বা আলস্য বিধাতা তাঁহার কোষ্ঠীতে লেখেন নাই।

আমার মা ও কাকিমা উভয় যাতায় কিরূপ ভাবে সংসার করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। তাঁহাদের নিয়ম ছিল,—গ্রামের সমস্ত দরিদ্র পরিবারের আহার হইয়াছে, ইহা না জানিয়া নিজমুখে অন্নজল দিতেন না। এজন্য বাটীর ছেলেরা সর্ব্বাগ্রে আহার করিয়াই, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া, সে দিন কাহার আহার হয় নাই বা হইবার উপায় নাই, এসংবাদ আনিয়া দিত। অভুক্ত-ব্যক্তিগণের জন্য তৎক্ষণাৎ অন্নব্যঞ্জনাদি বা তণ্ডুলাদি প্রেরিত হইত। অথবা তাহারা বাটীতে আসিয়া আহার করিতে চাহিলে, তাহাদিগকে সাদরে আনিয়া আহার করান হইত। পিতৃপিতামহের বহু ছাত্র ছিল। কর্ত্তারা যখন দেশের বাটীতে থাকিতেন, তখন ছাত্রেরাও বাটীতে থাকিতেন। তাঁহারা আমার পিতামহী, মাতা, বড় পিসীমা (১) ও মেজো কাকিমা প্রভৃতির অপত্যনির্ব্বিশেষ যত্নে ও শুশ্রূষায় স্ব স্ব গৃহ-পরিবারের কথা ভুলিয়া থাকিতেন। প্রতিবেশী জ্ঞাতি কুটুম্বেরা অনেকে আমাদের প্রসিদ্ধ খিড়কীর পুকুরে স্নান করিতে আসিয়া, অভুক্ত যাইতেন না। এসকলের পরিচর্য্যাদির জন্য গৃহে দাস-দাসীর সংখ্যা অধিক ছিল। বাটীতে ক্রিয়াকলাপের ছিড়ান মরিত না। এ সকল ব্যাপার, যাহা এক্ষণে অসাধ্য বা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে, তৎকালে তাহা সুশৃঙ্খলে ও সানন্দে, নির্ব্বাহিত হইয়াছে। পরস্পর বিরোধ বা কলহাদির নাম গন্ধও ছিল না।

প্রায় এমন ঘটিত যে, বাটীতে বৃহৎ ভোজের ব্যাপারে আমার মা ভোর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যজ্ঞশালায় জ্বলন্ত চুল্লীশ্রেণীর সহিত অশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া, শেষে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন! সে

(১) বড় পিসীমা বড় দরিদ্রের পত্নী। তাঁহার পরিবারসংখ্যাও অধিক। কিন্তু তদীয় পুত্রকন্যাদি ও আমরা সোদর-সোদরার ন্যায় অভেদে প্রতিপালিত। বরং আমাদের সংসারে বড় পিসীর প্রতাপ অধিক ছিল।

সময় আমার ঠাকুরমা তাঁহার শিরে ও বদনে শীতল জল দিয়া বীজন করিতেন, এবং তিনি সংজ্ঞালাভ করিলে, সরবৎ পান করাইতেন। কিন্তু তিনি নিজমুখে জল দিবার পূর্ব্বে বলিতেন,—ও মা! ইতর-ভদ্র সমস্ত লোকের ত, দাসদাসী প্রভৃতি সকলেরই ত পরিতোষপূর্ব্বক আহার হইয়াছে? আর কাহারও ত আহার করিতে বাকি নাই? পাকশাকে ত কোনও দোষ ঘটে নাই? ঠাকুরমা বলিতেন,—মা মা! আর কাহারও আহার করিতে বাকি নাই। সকলেই অন্নব্যঞ্জনের শতমুখে সুখ্যাতি করিয়াছে। তিনি আবার বলিতেন,—অমুক অমুক লোক জরাতুর বা পীড়িত, তাহাদের এখানে আসিবার শক্তি নাই, তাহাদের জন্য ত অন্নব্যঞ্জনাদি পাঠান হইয়াছে? অনন্তর যখন শুনিতেন,—অভুক্ত আর কেহই নাই, তখন আমার মা বলিয়া উঠিতেন,—ও মা! সকলের তৃপ্তি হইয়াছে শুনিয়া আমার উদর পরিপূর্ণ হইল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি দূরে গেল। মাগো! আপনি কি শুভ সংবাদ দিলেন! আপনার আশীর্ব্বাদে যেন এ ধর্ম্মের সংসার চিরদিন এইরূপেই চলিয়া যায়।

অনেক সময় এমন ঘটিত যে, বাটীর পরিবারবর্গ, ছাত্রবৃন্দ, আত্মীয়, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, অতিথি, অভ্যাগত, সকলকে আহার করাইয়া অপরাহ্ণে আমার মা ও কাকিমা, দুই যাতায়, সবেমাত্র আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় একজন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক আসিয়া অন্ন ভিক্ষা করিল। উভয়ের মুখে আর অন্ন উঠিল না। অমনি উভয়ে সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন তাহাকে ধরিয়া দিলেন (১)। অনন্তর তাঁহারা নিজের জন্য পুনরায় পাক করিতে অনিচ্ছুক হইলে, আমার পিতামহী আসিয়া স্বয়ং তাঁহাদের জন্য পাক চড়াইতেন, তখন আবার তাঁহারা তাঁহাকে ক্ষান্ত করিয়া স্বয়ং সে কার্য্য করিতেন।

যদি আমার মা শুনিতেন, গ্রামে কাহারও প্রবল পীড়া হইয়াছে, তাহার নিজ বাটীতে নানা কারণে নিয়ম মত চিকিৎসা বা শুশ্রূষা হইতেছে না, অমনি তিনি স্বয়ং যাইয়া তাহাকে পরম যত্নে নিজ বাটীতে আনিতেন এবং স্বহস্তে তাহাকে ঔষধ পথ্য সেবন করাইতেন। আমাদের গ্রামের ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অনেকেই পীড়িতাবস্থায় আমাদের গৃহে আনীত হইয়া, আমার পিতা-মাতার যত্নে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ দাদা মহাশয় কলিকাতা

---

(১) তাঁহাদের ঐরূপ ঘটনায় অনাহারে না থাকিতে হয়, এজন্য আমার পিতৃদেবের দৈনিক নিয়ম ছিল যে, প্রত্যহ তিনি স্বয়ং আহার করিয়া উঠিয়াই, বাটীর সন্নিহিত 'সকের হাট' নামক বাজারে যাইতেন, এবং তথায় শেষ হাটের মৎস্যাদি যাহা পাইতেন, আনিয়া দিতেন। সেই সকল জেলে-মেছুনিদের বলা ছিল যে, তাহারা বাটী ফিরিবার সময় অবশিষ্ট মৎস্যাদি যেন তাঁহার বাটীতে দেয় ও আহার করিয়া যায়। এজন্য তিনি প্রবাসে গেলেও, বাটীতে মৎস্যাদির অভাব ঘটিত না।

গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত, বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র সোমপ্রকাশের প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক এবং রোম ও গ্রীসের ইতিহাস, বিশ্বেশ্বর-বিলাপকাব্য, নীতিসার প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থের লেখক। আমাদের অঞ্চলে হরিনাভি-উচ্চ ইংরাজি স্কুলের ইনিই প্রতিষ্ঠাতা। ইনি স্বদেশের বিবিধ সৎকার্য্যের প্রধান সহায় ছিলেন। স্থানান্তরে প্রসঙ্গক্রমে ইঁহার কথা বলা হইবে। ইনি আমার মাতা-পিতার বিয়োগে,—স্বয়ং মাতৃপিতৃ-হীন হইলেন এবং দেশ অনাথ হইল, বলিয়া গভীর শোক প্রকাশ করিয়া সোমপ্রকাশে তৎকালে বারংবার সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া-ছিলেন।

আমার ৺মাতৃদেবীর সতীত্বপ্রভাব দেশমধ্যে বড়ই জাজ্বল্যমান ছিল। তিনি প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিলে, পল্লীস্থ সধবারা আসিয়া হুড়াহুড়ি করিয়া, তাঁহার সীমন্তে সিন্দূর পরাইত। সকলের বিশ্বাস,—তদীয় সীমন্তে সিন্দূরদান করিলে, পতির আয়ু ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি পায়। শিশুসন্তান যাহারি হউক, যে জাতীয় হউক, আমার পিতা-মাতার নিকট নিজ অপত্যনির্ব্বিশেষ বা ততোধিক। কেহ আমার মাকে কোনও মিষ্টান্ন খাইতে দিলে, তাহা তাঁহার অঞ্চলে বাঁধা থাকিত। কোনও একটী শিশুকে দেখিলেই, সে যাহার বা যে জাতির হউক, স্নেহভরে তাহা তাহার হস্তে দিতেন। আমার পিতামাতা শিশুসন্তানমাত্রেই ও গোজাতিতে প্রকট দেবত্ব দর্শন করি-তেন। এস্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি;—

একদা আমার পিতা মজিলপুরগ্রাম হইতে (১) ডোঙ্গা করিয়া বাটী আসিতে-ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার ছোট পিসীমা ও তাঁহার শিশুসন্তান ছিল। মজিল-পুর হইতে যাত্রা করিবার সময় উক্তগ্রামের জমিদার বাবুদের পরিবারেরা পিতাকে বহু-মূল্য গরদের জোড় পরাইয়া, সঙ্গে মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়াছিলেন। তিনি মাজিদের পশ্চাৎ দিকে সম্মুখ করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহার পশ্চাতে পিসীমা নিদ্রিতা। পিতা দেখিলেন,—ডোঙ্গাড়েদের একটী ৮।৯ বর্ষের শিশু চক্ষু মুদিয়া কাতরস্বরে যাতনা প্রকাশ করিতেছে। তাহার চক্ষু উঠিয়া-ছিল। চক্ষুদুটী স্ফীত ও ক্লেদরাশিতে পরিপূর্ণ। আনুষঙ্গিক প্রবল জ্বর। পিতৃ-দেব আস্তে আস্তে তাহাকে নিজ কোলে তুলিয়া লইলেন। ডোঙ্গাড়েরা, সে দিকে পাছু ফিরিয়া থাকায়, তাহা দেখিতে পাইল না। তাহাকে কোলে লইয়া, তিনি পরিধেয় বস্ত্রপ্রান্ত বারংবার ভিজাইয়া, তাহার চক্ষুর ক্লেদ মুছাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার নয়নক্লেদে তাঁহার সেই বহুমূল্য পট্টবস্ত্র পূর্ণ হইল। অহো! করুণার কি মহিমা! প্রেমময় হৃদয়ের কি

(১) জয়নগর, মজিলপুর প্রভৃতি গ্রাম সকলে বহু দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বাস। ঐ সকল স্থানে আমাদের বহু কুটুম্ব। ক্রিয়াবান্ দত্ত বাবুরা ঐ স্থানের জমিদার। আমার ছোট পিসীমার ঐ স্থানে শ্বশুরালয়।

প্রভাব! প্রেমিকের করস্পর্শের কি আশ্চর্য্য শক্তি! সেই সাধুপুরুষের হস্তরূপ স্পর্শমণির স্পর্শে সেই নাবিকশিশুর বীভৎস নেত্ররোগ নির্ম্মূল হইল। সেই সঙ্গে তাহার সে প্রবল জরও অন্তর্হিত হইল। সেই অভূতপূর্ব্ব স্পর্শসুখে সে শনৈঃ শনৈঃ নিদ্রায়মাণ হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। সে স্বচ্ছন্দে গভীর নিদ্রা গেল।

পিতৃদেব যখন তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া, নিজ পরিধেয় ভিজাইয়া, তাহার নেত্রক্লেদ মুছাইতেছিলেন, তখন তাঁহার ভগিনী নিদ্রা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া, সেই ব্যাপার দেখিয়াই শীহরিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতাগ্রণী, বিশ্বপূজিত জ্যেষ্ঠ সোদরকে তাদৃশ ঘৃণিত কার্য্য করিতে দেখিয়া তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন,—ও মা গো! ছি-ছি-ছি! কি ঘেন্নার কথা! দাদা! ও কি করিতেছেন? এই অস্পৃশ্য বাগ্দীর ছেলের পূঁয-রক্ত-ক্লেদ ঘাটিতেছেন! ঐ বহুমূল্য, চিক্কণ পট্টবস্ত্র দ্বারাই ঐ কাজ করিতেছেন! আমার পিতা বলিলেন,—শ্যামা! তুই ছেলের মা হইয়া কি কথা বলিলি? ছেলে ত সকলেই সমান। শিশুর, বিশেষতঃ রোগার্ত্ত শিশুর আবার জাতি কি? চক্ষু অতি কোমল অঙ্গ, উহাতে মলিন বা কর্কশ বস্ত্র প্রয়োগ করিতে নাই। এই পট্টবস্ত্র সূক্ষ্ম ও কোমল, তাই ইহা ভিজাইয়া মুছাইতেছি। দেখ দেখি! আজি কত দিনের পর শিশুটী কেমন আরামে ঘুমাইতেছে! আমার পিসীমা ঐ কথা শুনিয়া অনুতাপে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি যখনি ঐ কথা কাহারও কাছে বলিতেন, তাঁহার চক্ষু বাষ্পার্দ্র হইত। অনন্তর আমার পিতৃদেব বাটী আসিলে, আমার মা সেই নাবিকশিশুকে নানা মিষ্টান্ন, বস্ত্র ও খেলনা দিয়া বিদায় করিলেন।

হায়-হায়-হায়রে! এ হতভাগ্য নরাধম, সেই অপার্থিব দেবদম্পতীর কি অযোগ্য সন্তান! দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি নাই। তাই আজি অহোরাত্র হৃন্মর্মভেদী হাহাকার ও বক্ষঃপ্লাবিনী অশ্রুধারা আমার সার হইয়াছে! যদি আমার এদশা দেখিয়া, সময় থাকিতে, কাহারও মনে গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত হয়, তবে আমার এ মর্ম্মদাহও মঙ্গলের বিষয়। অথবা, সেই দয়াময়ী বিশ্বজননী যখন যা ঘটান, সকলি জীবের মঙ্গলেরি জন্য। সর্ব্বমঙ্গলার রাজ্যে অমঙ্গল কোথায়?

আমার পিতৃদেব একদা বর্ষাকালের ভয়ানক কর্দ্দমে গ্রামস্থ কোনও পীড়িত লোককে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি কর্দ্দমভারাক্রান্ত চরণে বাটী আসিলে, আমার মা গিয়া তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিলেন। তিনি তখন আরাম বোধ করিয়া বলিলেন,—আঃ! বাঁচিলাম! দেখ! আমি যেখানেই যাই, আমার পিতামাতার কৃপায়, বর্ষার এই কাদার ন্যায় প্রভূত অর্থ ও দ্রব্যাদি আমাকে জড়াইয়া ধরে। যতক্ষণ না তাহা দান করিয়া ফেলি, ততক্ষণ বড়ই অশান্তিবোধ হয়। নিঃশেষে দান করিয়া

ফেলিলেই আরাম লাভ করি। নিম্নলিখিত শ্লোকটী সর্ব্বদা তাঁহার মুখে শুনিতাম ;—

অর্থাঃ পাদরজঃসমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনং
মানুষ্যং জললোলবিন্দুচপলং ফেনোপমং জীবনং।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনং
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে॥"

পায়ের ধুলার ন্যায় বিভবসকল,
নদীর স্রোতের ন্যায় যৌবন চঞ্চল ;
মানবের পরমায়ু জলবিম্ব প্রায়,
জীবন ফেনের ন্যায় মিলাইয়া যায়,
ধর্ম্মই অক্ষয় স্বর্গসুখের কারণ,
প্রাণপণে যে না করে ধর্ম্ম-আচরণ,
বৃদ্ধকালে হয় তার অনুতাপ সার,
নিদারুণ শোকানল দহে অনিবার।

(ক্রমশঃ)

পারস্য কবি সেখ সাদি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৫৪। যদি তোমার অন্তর সর্ব্বদা বহির্জগতে আসক্ত থাকে, তাহা হইলে, তুমি সংসার ছাড়িলেও পবিত্র হইবে না,—আর বিপুল ধন, জন, মান সত্ত্বেও যদি তোমার অন্তর ঈশ্বরে চিরনিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তুমি যথার্থ সাধু।

একজন এক সুলেখককে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এরূপ শিষ্টাচার কাহার নিকট শিখিয়াছেন ?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি শিষ্টাচার ও সদাচার-বিরোধী অবিনয়ী ব্যক্তিদের নিকট শিখিয়াছি। তাহাদের আচরণে যাহা কিছু দোষাই দেখি, তাহাই যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে চেষ্টা করি। তাহাদের রহস্যালাপ হইতে অনেক শিখা যায়। সেইরূপ মূর্খের নিকট সদালাপ করিলে, তাঁহারা বিদ্রূপ বলিয়া উড়াইয়া দেয়।"

৫৫। এক রাজা একজন ফকিরকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ফকির মনে করিল, রাজার সম্মুখে স্বল্পাহার করাই ভাল, কারণ তাহা হইলে রাজা আমার সাধুতার আরও প্রশংসা করিবেন। ইহা ভাবিয়া আপনাকে দুর্ব্বল ও আহারে অপটু করিবার মানসে ফকির এক ঔষধ সেবন করিল। কিন্তু ঔষধ বিষপূর্ণ থাকায় ফকিরের প্রাণ নাশ হইল। রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইল না, আর যশোলিপ্সাও দূর হইল।

৫৬। পথিমধ্যে চোরে কতকগুলি বণিকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলে, তাহারা "হা হতোঽস্মি—" বলিয়া মহা ক্রন্দন করিতে লাগিল ও অপহৃত দ্রব্যগুলির পুনঃপ্রাপ্তির অভিলাষে তস্করদিগের অনেক স্তব স্তুতি করিল। কিন্তু তাহারা তাহাতে

কর্ণপাত করিল না। সেই বণিক্‌দিগের সঙ্গে একজন বিখ্যাত নীতিজ্ঞ পণ্ডিত যাইতে-ছিলেন। একজন বণিক্ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"মহাশয়! আপনি যদি উহাদিগকে কিছু সুনীতি শুনান, হয় ত উহারা আমাদের দ্রব্য ছাড়িয়া দিবে।" পণ্ডিত উত্তর করিলেন,—"উহাদিগকে নীতিশাস্ত্রের কথা বলা বৃথা। লৌহে একবার ময়লা ধরিলে, তাহা আর কিছুতেই পরিষ্কার হয় না। এই সকল দুরাত্মাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে কি ফল হইবে? কঠিন প্রস্তরে কি সামান্য লৌহফলক প্রবেশ করিতে পারে? কিন্তু কেবল ইহাদের দোষ দেওয়া উচিত নয়। যদি মানুষ সম্পদের সময় গরিব দুঃখীর কষ্ট বিবেচনা করে, তাহা হইলে তাহারা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে না। ভিক্ষুক দ্বারস্থ হইলে ভিক্ষা দিবে, নচেৎ ধন তস্করে লুণ্ঠন করিবে।"

৫৭। এক ব্যক্তি ফকিরের কাছে প্রতিদিন যাইত। ফকির একদিন তাহাকে বলিল,—তুমি প্রত্যহ আমার কাছে না আসিয়া একদিন অন্তর আসিবে। তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পাইবে। সূর্য্যকে আমরা প্রতিদিন দেখি। তাহার কত শোভা, কত গুণ; কিন্তু কে তাহাকে ভালবাসে? কেবল বর্ষাকালে যখন সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তখনই লোক তাহার প্রয়াসী হয় ও তাহাকে ভালবাসে।"

৫৮। এক রাজা কোনও সাধুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কিরূপে তাঁহার মূল্যবান্ সময় অতিবাহিত করেন। সাধু বলিলেন, "আমি সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরোপাসনায় ও ধ্যানে কাটাই। প্রাতঃকালে ভরণ পোষণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। দিবসে আহার্য্যাদি ভিক্ষা করি।" রাজা সাধুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সাধুর দৈনিক সংসারনির্বাহের অর্থ দিতে আদেশ করিলেন। সংসারচিন্তায় যে ব্যাকুল, তাহার স্বাধীনতা নাই। স্ত্রী-পুত্র কি আহার করিবে, কি পরিধান করিবে, এই চিন্তাই যাহার দিবানিশি, সে ঈশ্বরে কখন মন দিবে?

৫৯। সিরিয়া দেশের এক ফকির বহুকাল অরণ্যে বাস করিয়া নিরন্তর তপজপে রত থাকিতেন ও সামান্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিতেন। সেই দেশের রাজা একদা তীর্থভ্রমণোপলক্ষে ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—"যদি আপনি আমার রাজধানীতে যাইতে ইচ্ছা করেন, আমি আপনার জন্য এমন আবাস প্রস্তুত করাইয়া দিতে পারি, যেখানে আপনি স্বচ্ছন্দে উপাসনা করিতে পারেন এবং জনসাধারণও আপনার নিকট শিক্ষালাভ ও আপনার বিমল চরিত্রের অনুকরণ করিতে পারে। ফকির এ প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত হইলেন না। পরে মন্ত্রিগণ অনেক বুঝাইলেন ও বলিলেন, "যদি আপনি দেখেন যে মন্দ লোকের সংসর্গে আপনার চরিত্রে দোষ জন্মিতেছে কিংবা আপনার পবিত্রভাব হ্রাস বা হানি হইতেছে, তাহা হইলে আপনি

ইচ্ছামাত্রেই পুনরায় অরণ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন।" শেষে ফকির তাহাদের কথায় ভুলিলেন ও রাজধানীতে আসিলেন। রাজা নানাপুষ্পশোভিত এক সুরম্য উদ্যানে তাঁহার বাসের জন্য এক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন ও তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য বহু দাসদাসী নিযুক্ত করিলেন। সেই অতুল ঐশ্বর্য্য ও সংসারের প্রলোভনের মধ্যে বাস করিলে মুনিগণেরও সংযমের বিপর্য্যয় ঘটে। যে ফকির পর্ণাহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন, ছাই ভস্মে যাঁহার অঙ্গরাগ হইত, তিনি আজি প্রাসাদে থাকিয়া নানাবিধ অপূর্ব্ব ভক্ষ্য ভোজন, চন্দনাদি অনুলেপনে গাত্রসংস্কার ও বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া, সেই বহু দাসদাসীর সহিত পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বহু বৎসর ব্যাপিয়া ফকির যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সব বৃথা হইল। সাধুর মুখে শাস্ত্রালাপে ও নিজের অধ্যবসায়ে যে সকল জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সংসারে মিশিয়া সে সমস্ত নষ্ট হইল। মধুর কলসীতে পড়িয়া মক্ষিকার যে দশা, সংসারকূপে পড়িয়া ফকিরেরও সেই দশা ঘটিল।

একদিন রাজা আসিয়া দেখিলেন যে, ফকিরের জীর্ণ শীর্ণ পরিশুষ্ক মলিন দেহ নাই, এখন তিনি বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ও কান্তিমান্ হইয়াছেন। মখমল্ ও কিংখাপ-বিনির্ম্মিত শয্যায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া আরাম করিতেছেন। কিঙ্কর-কিঙ্করী ময়ূরপুচ্ছ-দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতেছে। তদ্দৃষ্টে রাজা ঈদৃশ অবস্থান্তরের জন্য ফকিরকে অভিনন্দন করিলেন ও নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শেষে রাজা বলিলেন যে, তিনি জ্ঞানী ও ফকির—এই দুই শ্রেণীর লোককে বড় ভালবাসেন। তাহা শুনিয়া একজন বহুদর্শী মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! ভালবাসার এই নিয়ম, যে যাহাকে ভালবাসে, সে যাহাতে তাহার মঙ্গল হয়, এরূপ দান করে। আপনি পণ্ডিতকে ধন দান করিবেন যে, সে অপরকে শিক্ষাদান করিতে পারে। ফকিরকে অর্থদান করিবেন না। ফকিরের অর্থে প্রয়োজন কি? একবার অর্থের স্বাদ জানিলে সে বার বার অর্থের প্রত্যাশী হইবে। যাহার মনপ্রাণ ঈশ্বরে অর্পিত, যে ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন, সে ভিক্ষা করে না, প্রেমামৃত-পানে সদা বিভোর। সংসারের সুখে তাহার প্রাণ আর কদাচ আকৃষ্ট হয় না।"

৬০। একজন সম্ভ্রান্ত লোক এক ফকিরকে বলিলেন, "দেখুন অমুক ফকিরের নামে অনেকে নানা কথা বলে। তাহার সম্বন্ধে আপনার মত কি?" ফকির বলিলেন, —"আমি বাহ্যিক ব্যবহারে কিছু অসদৃশ দেখি না। তাহার মনের ভিতর কি আছে আমি তাহা জানি না। আপনি যাহাকে ফকিরের বেশে দেখিবেন, তাহাকে সাধুর ন্যায় সম্মান করিবেন। যদি তাহার মনের মধ্যে কি হইতেছে জানিতে না পারেন তাহা হইলে তাহার নিন্দা করিয়া ফল কি?"

৬১। এক মাতাল নেশায় অভিভূত হইয়া রাজপথে পড়িয়াছিল। এক ফকির ঘৃণার সহিত দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিল। মাতাল মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক বলিল,—"লজ্জাজনক কর্ম্ম দেখিলে লোকে অনুকম্পা প্রকাশ করে। আপনার উচিত পাপীকে দেখিয়া তাহার দোষ ঢাকিয়া লওয়া। আমার সকল দোষ ত আপনি বিদিত আছেন, তবে আপনি আমাকে দয়া করিবেন না কেন? কাজে আমি নীচ বটে, কিন্তু আপনি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া আপনার মহত্ত্বের পরিচয় দিউন।"

৬২। দানশীলতা ও সাহস, এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী অধিক প্রশংসনীয়, এই প্রশ্ন এক পণ্ডিতকে করা হইলে, তিনি বলিলেন, "যাহার দানশীলতা আছে, তাহার সাহসের প্রয়োজন নাই।" এক জনের সমাধিস্তম্ভে এই লেখা ছিল, "দিগ্বিজয়ীর বাহু অপেক্ষা দাতার বাহু অধিক বলশালী। হাতিম তাই এই জগতে আর নাই, কিন্তু বদান্যতার জন্য তাঁহার নাম অনন্তকাল থাকিবে। ধনের কিয়দংশ দান করিবে। দ্রাক্ষালতার শাখা প্রশাখা যতই কর্ত্তন করিবে, ততই তাহাতে ফল ধরিবে।"

৬৩। একজন বলশালী লোক ক্রোধে অধীর হইয়া চারিদিকে হস্তপদ বিক্ষেপ করিতেছিল; তাহার মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হইতেছিল। তাহার এ মূর্ত্তি দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল,—ইহার এরূপ ক্রোধের কারণ কি? কোনও ব্যক্তি বলিল,—একজন ইহাকে কুবাক্য বলিয়াছে। প্রথম ব্যক্তি বলিল,—কি আশ্চর্য্য! এ হতভাগা এরূপ বলিষ্ঠ যে, এ অনায়াসে বিশ মন পাথর বহিতে পারে, কিন্তু সামান্য কথার ভার সহিতে পারে না? যখন তাহার মন এত লঘু, তখন তাহার বাহুর বিক্রম ও মনুষ্যত্বের গর্ব্ব করা ভাল দেখায় না। এরূপ পুরুষে আর নারীতে কি প্রভেদ? পরাক্রমশালী হইলেও মিষ্ট কথা বলা সকলের উচিত। অপরকে প্রহার করিলে সাহসের পরিচয় হয় না। মুষ্ট্যাঘাতে হস্তীর মস্তক চূর্ণ করিতে পারিলেও বীর বলা যায় না, যদি মনুষ্যত্ব না থাকে। যখন দেহ ধূলায় সৃষ্ট, তখন যে মানুষ ধূলার মত নম্র না হয়, তাহার স্থান মনুষ্যপদবীর অনেক নিম্নে।

৬৪। হে করুণাময় ঈশ্বর! এই মহাপাপী ও অজ্ঞ সন্তানের কাছে তুমি কি প্রত্যাশা করিতে পার? আমি ত তোমার আজ্ঞা কখন কখন পালন করি নাই, যাহা করিলে তোমার দয়াল নাম সার্থক হয়, তাহাই কর। আমি তোমার দ্বারে অবনত মস্তকে উপস্থিত হইয়াছি, আমাকে ক্ষমা করিতে হয় কর, দণ্ড দিতে হয় দাও, সকলই তোমার ইচ্ছাধীন। তোমার আজ্ঞা কখনও পালন করেছি বলিয়া তাহার অনুমোদন করিতে তোমাকে বলি না, কিন্তু আমার পাপসকল তুমি নিজগুণে ক্ষমা কর।

৬৫। হে ঈশ্বর! আমাকে রক্ষা কর! আমাকে ক্ষমা কর! যদি একান্ত

আমাকে দণ্ড দাও, তবে বিচারের দিনে আমার চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া রাখিও, যেন আমি সাধুগণের সম্মুখে লজ্জিত না হই। প্রতিদিন প্রাতে ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইয়া আমি এই প্রার্থনা করি, হে প্রেমময়! তোমাকে আমি কখনও ভুলিতে পারিব না, এ দাসের প্রতি যেন তোমার কৃপা-কটাক্ষ পড়ে।

৬৬। কোনও সময়ে এক রাজার হস্তে কোনও বিশেষ কার্য্যের ভার পড়িলে, রাজা মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, যদি কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ফকিরদিগকে সহস্র মুদ্রা দিব। কৃতকার্য্য হইয়া রাজা সন্তুষ্ট চিত্তে কোন অনুগত ভৃত্যকে সহস্র মুদ্রা বণ্টন করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য বড় চতুর; সে সমস্ত দিন ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া প্রভুর পদপ্রান্তে মুদ্রাগুলি রাখিয়া বলিল,—আমি সারাদিন ঘুরিয়া কোনও ফকির দেখিতে পাইলাম না। রাজা বলিলেন,—সে কি? আমি জানি, এই নগরে চারিশত ফকির আছে। ভৃত্য বলিল,—মহারাজ! যে ফকির, সে অর্থ গ্রহণ করে না। যে অর্থ গ্রহণ করে, সে ফকির নয়। রাজা ঈষদ্ধাস্য করিয়া পারিষদ্বর্গকে বলিলেন, "ঈশ্বরপরায়ণ বলিয়া আমি ফকিরদিগকে ভক্তি করি। এই ভৃত্য কি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া বলিতেছে, যে অর্থ গ্রহণ না করে, এমন ফকির নাই।"

৬৭। একজন অল্পবয়স্ক যাজক তাহার গুরুকে বলিলেন, "মহাশয়! অধুনা যে সকল ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা শুনা যায়, তাহাতে আমার মন আকৃষ্ট হয় না; বক্তারা মনুষ্যকে সংসার ত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং ধন ও ধান্য সঞ্চয় করিতে সর্ব্বদা ব্যগ্র! শিক্ষা উচ্চ হইলেও কেবল শিক্ষকের কথায় কোনও ফল হয় না। যিনি স্বয়ং কুকর্ম্ম করেন না, তিনিই যথার্থ বিজ্ঞ; যিনি স্বয়ং পাপী অথচ লোককে পাপ হইতে বিরত হইতে বলেন, তাঁহাকে বিজ্ঞ বলা যায় না; যিনি স্বয়ং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসাধনায় তৎপর ও বিপথগামী, তিনি কেমন করিয়া সৎপথের প্রদর্শক হইবেন?" গুরু বলিলেন, "বৎস! তুমি ভুল বুঝিয়াছ, ধর্ম্মযাজকগণ যে সকল উপদেশ দান করেন, তাহার প্রত্যাখ্যান কিম্বা সেই সকল উপদেশের বিপরীতাচরণ করা উচিত নয়; তাঁহাদের দোষ আছে, ইহাও মনে করা ভাল নয়। দোষশূন্য শিক্ষকের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইলে জ্ঞান লাভ করা যায় না। বিপনিতে বিক্রয়ার্থ নানা দ্রব্য থাকে, যাহার যেমন সামর্থ্য, সে সেইরূপ ক্রয় করে। যাজকের শিক্ষাও সেইরূপ। শিক্ষালাভ করিতে হইলে সরল অন্তঃকরণে শিক্ষকের কাছে যাইতে হয়। শিক্ষক আপন শিক্ষার বিপরীতাচরণ করিলেও তাঁহার শিক্ষা গ্রহণীয়।"

৬৮। এক রাজার তোরণস্তম্ভে এই লেখা ছিল,' "ভাত! পৃথিবী চিরদিনের জন্য নহে, যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাতেই মন-প্রাণ অর্পণ কর এবং

তাঁহাকে লইয়াই তুষ্ট হও। সংসারাসক্ত হইও না। তোমার মত কত শত লোক সংসারে মজিয়া বিনষ্ট হইয়াছে। যখন আত্মা দেহ হইতে একদিন চলিয়া যাইবে, তখন সিংহাসন আর ভূমিশয্যা উভয়ই সমান।"

৬৯। পৃথিবীতে কত বীর জন্মিয়াছিল, তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু নসিরবণের বদান্যতার কথা অদ্যাপি কেহ বিস্মৃত হয় নাই। দিন থাকিতে জীবনের সদ্ব্যবহার কর, যেন লোকে না বলে— সে ব্যক্তি আর নাই।

৭০। আরবদেশের একজন রাজার মুমূর্ষু দশায় এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজার সৌভাগ্যবশতঃ শত্রুপক্ষীয় সকল সেনা পরাভূত ও তাহাদিগের দুর্গ অধিকৃত এবং সকল প্রজা বশতাপন্ন হইয়াছে। রাজা শুনিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এ শুভ সংবাদ আমার জন্য নহে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরাধিকারীদিগের জন্য; আমার চিরদিনের আশা পূরণ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি এখন মৃত্যুমুখে পড়িয়াছি, আমার জীবন আর ফিরিবে না, আমার সংসার হইতে বিদায়ের ঢাক বাজিতেছে! চক্ষুদ্বয়! আমার মস্তকের সহিত আর তোমাদের সম্বন্ধ নাই। হস্তপদ! তোমরা এখন পরস্পর বিদায় গ্রহণ কর। শত্রুর মুখ উজ্জ্বল করিয়া মৃত্যু আমাকে অভিভূত করিয়াছে। বন্ধুগণ! তোমাদিগকেও একদিন সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। আমি মূর্খের মত কত আচরণ করিয়াছি, তোমরা আমার দৃষ্টান্তে শিক্ষা লাভ কর।"

৭১। একজন নসিরবনের পুত্র হরমুজকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পিতার মন্ত্রিবর্গকে আপনি কি দোষে কারাবদ্ধ করিলেন? তিনি বলিলেন,—"তাহাদের বিশেষ কোন দোষ দেখি নাই, কিন্তু লোকে আমাকে তাহাদের সম্মুখে সম্মান করিলে তাহাদের কোন ভাবান্তর হয় না। আর তাহারা আমার কথার উপর বিশ্বাস করে না, সুতরাং আমি রাজনীতি অনুসারে তাহাদিগকে কারাগারে পাঠাইয়াছি। রাজনীতি এই যে, যদি বিজ্ঞ হও, তাহা হইলে যে তোমাকে ভয় করে, তাহাকে ভয় করিবে, যদিও তাহার মত শত জন আপাততঃ তোমার সমকক্ষ না হয়। কোন দিন রাখাল সর্পের মস্তক প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিবে এ ভয়ে সর্প রাখালের পদতল দংশন করে।

শিবরাত্রি।

আত্মসাক্ষাৎকারই জীবের পরম মোক্ষ। 'শিবোহহং' এই সারগর্ভ বাক্যটী যখন জীবের বোধগম্য হয়, তখন শিব হইতে জীবের আর বৈষম্যভাব থাকে না। অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী অপরা মায়ার দ্বারা জীব যতক্ষণ সমাচ্ছন্ন থাকেন, ততক্ষণই

অহমিকাবশে শিব হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করেন। যখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড় রিপু জয় করিয়া জীবের আত্মজ্ঞান অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতে সেই একই বিরাট পুরুষ বিদ্যমান আছেন ইহা বোধগম্য হয়, তখন আর ভেদাভেদ থাকে না। ভেদভাব তিরোহিত হইলেই জীবের শিবত্ব প্রাপ্তি হয়। শিবত্বপ্রাপ্তির নিমিত্ত-বিধায়ী ঋষিদিগের দ্বারা শিবরাত্রিকল্প প্রচলিত হইয়াছে। শিবরাত্রির স্থূল উপাখ্যান এই ;—

এক নিষাদ মৃগয়ালব্ধ মাংসসম্ভার লইয়া, আপন গন্তব্য স্থানাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। পথিমধ্যে শর্ব্বরী সমাগতা দর্শনে, যামিনীযাপনার্থ সন্নিকটস্থ শ্রীফলমহীরুহে আরোহণপূর্ব্বক পশুমাংসসম্ভার বিল্বশাখায় রাখিয়া, অপর দিকে স্বয়ং নিদ্রামগ্ন হইল। সেদিন মাধবের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি, রজনী ঘোর তমিস্রাময়ী ; মৃদু মন্দ মলয়ানিল সঞ্চলিত হইতেছিল, নবকিশলয়োদ্গমকালহেতু সমীরণস্পর্শে পুরাতন শুষ্ক পল্লব রাজি পতিত হইতেছিল। দেবাদিদেব শূলপানি শম্ভু, সনাতনী শক্তি পার্ব্বতীর সহ নৈশ পরিভ্রমণার্থে বহির্গত হইয়াছিলেন। বিহারান্তে সেই শৈলুষবৃক্ষমূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। নিষাদ-রক্ষিত মাংস হইতে বিন্দু বিন্দু যে শোণিত নিপতিত হইতেছিল, তাহা স্থাণুর রজত-অঙ্গে পড়িতে লাগিল। সেই সময়ে পবনবেগে, বিল্বপত্র স্খলিত হইয়া দেবদেব মহাদেবের গাত্রে পতিত হইতে লাগিল। ভূতভাবন ভোলানাথ অনুমান করিলেন, এই গভীরা রজনীতে জাগ্রত থাকিয়া কোনও ভক্ত আমার অর্চনা করিতেছে। পিনাকপাণি মহেশ্বর সাতিশয় তুষ্ট হইয়া কহিলেন "কে ভক্ত আমার পূজা করিতেছ? বর গ্রহণ করিবে এস!" মহাদেবের আহ্বানে কিরাতের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে শশব্যস্তে বিল্ববৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া ভূতনাথ মহেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করত প্রণাম পুরঃসর স্বকৃতপাপের নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। মঙ্গলময় শিব অভয় প্রদান করিয়া বর দিলেন। শিবের বরে কিরাতের মোক্ষ লাভ হইল।

ইহার সূক্ষ্ম ভাবার্থ মনে হয়,—ব্যাধ অর্থে দেহধারী জীব ; পরস্পর ভেদ ভাবিয়া হনন, তাড়ন, পীড়ন করাকে মৃগয়া কহা যায়। মৃগয়ান্তে জীব যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে যায় অর্থাৎ সালোক্যের প্রয়াসী হয়, তখন ঘোরা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি উপস্থিত হয়, এস্থলে সংশয় ও নৈরাশ্যকেই কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রজনী বুঝায়, কেননা সংসারী জীবের মনে হয়,—আমি পাপী, তাঁহার সাযুজ্য পাইতে পারিব না, তিনি বৃহৎ আমি ক্ষুদ্র, তাঁহাতে আমাতে মিলন অসম্ভব। এই ধারণায় অগত্যা জীব সাযুজ্য বিষয়ে অনন্যোপায় হইয়া শ্রীফলবৃক্ষশাখোপরি নিদ্রিত হয়। শ্রী, অর্থে ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্যপূর্ণ পরিদৃশ্যমান

স্থূল জগৎ, আর ফল অর্থে কর্ম্মফল। নিদ্রিত যে, মোহাচ্ছন্ন তাকেই বলে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মোহাক্রান্ত জীবের এই সংশয়াপন্ন অবস্থা দর্শনে অগতির গতি মহাদেব অযাচিত করুণা-বলে তাহাকে বর (মুক্তি) প্রদানার্থে সাদর আহ্বান করেন। সেই অভয়বাণী শ্রবণে জীবের নিদ্রাভঙ্গ হয় (মোহ কুহেলিকা অপসারিত হয়।) তখন জীব দেখিতে পান,—বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-রূপ শ্রীফল-বৃক্ষমূলে মন ও বাণীর অতীত অনাদি অনন্ত মঙ্গলনিদান শিব বিদ্যমান রহিয়াছেন,—

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, পরব্রহ্ম; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; তিনি শান্ত অদ্বিতীয় শিব। তাঁহাতে বৈষম্য নাই তিনি সাম্য। বহিশ্চক্ষে বিভিন্ন রূপ দেখাইলেও মূলে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ শিব ওতঃপ্রোত রূপে বিরাজমান। দেহী আকারে বিভিন্ন পর্য্যায় হইলেও আত্মা নিত্য অদ্বয়। যেমন পত্র-পুষ্প-ফল-মূল শাখা-বল্কল প্রকাশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হইলেও একই বীজ হইতে সকল গুলির উৎপত্তি, সেইরূপ জীব ও শিব চির অভিন্ন। শিবরাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া শিবপূজা করিবার বিধির তাৎপর্য্য এই,—শিবজ্ঞান হইলে জাগরণ অর্থাৎ চেতনা জাগ্রত রাখিতে হয়। জীবনের চারি দশাকে চারি প্রহর বুঝায়। বাল্য, যৌবন প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্য এই চারি প্রহরে স্মরণ রাখা উচিত, আমিই সেই শিব,— "শিবোঽহং।"

নমঃ শিবায়।
ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র।
শোভাবাজার-রাজবাটী।

মা! তুমি শোভাবাজার-রাজবাটীর শোভা।—শ্রীতারাকুমার।

অদ্ভুত ঘটনা।

জেলা ২৪ পরগণা, থানা ভাঙ্গড়, ক্রোলবেড়িয়া গ্রামনিবাসী রামসাধন গাইনের বয়স ৪৫ বৎসর, জাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয়। উহার স্ত্রী মনোমোহিনী দাসী কলেরা রোগে প্রায় ১২ বৎসর কাল হইল মারা পড়িয়াছিল। ব্যাওতানিবাসী দীপচাঁদ মণ্ডল তাহার পিতা ছিল। ঐ কন্যার মৃত্যুর পর তাহার মাসীর আর একটী কন্যা জন্মে। তাহাদের নিবাস বালগোড়। গত পৌষ মাসে ঐ কন্যাটী তাহার মাতার সহিত বামনমল্লার মেলা দেখিতে যাইতেছিল, পথিমধ্যে ক্রোলবেড়িয়া গ্রাম দেখিয়া ঐ কন্যাটী প্রকাশ করিল যে, ঐ পুকুর, তালবাগান ও ঐ বাটী তাহার পূর্ব্বজন্মের

স্বামীর। ঐ কথা বলিয়া তাহারা সেই বাটীতে প্রবেশ করিল। ঐ কন্যাটী তাহার পূর্ব্বজন্মের শাশুড়ীকে নমস্কার করিয়া প্রকাশ করিল যে, ইনি আমার শাশুড়ী ছিলেন এবং এই ঘর ও এই ছেলেরা আমার ছিল। সে রামসাধন গাইনকে বলে যে, তুমি আমার স্বামী। তুমি আমাকে বিবাহ কর, তুমি আমাকে বিবাহ না করিলে আমি আত্মহত্যা করিব। রামসাধন বলিল, তুমি যে আমার স্ত্রী, তাহার নিদর্শন কি? তখন ঐ মেয়েটী প্রকাশ করিল যে, আমার মৃত্যুর সময় আমার আঁচলে ৬৲ টাকা বাঁধা ছিল; তুমি খুলিয়া লইলে, আর মৃত্যুর সময় আমার বড় ছেলেকে এক বক্‌নো গহনা ও টাকা দিয়া গিয়াছিলাম, স্মরণ কর, দেওয়ালের মুরলীর মাথায় চুলের দড়ি ও সিন্দূরের কৌটা রাখিয়া গিয়াছিলাম। সিন্দুকের ভিতরে আমার মাথার দুইটা কাঁটা রাখিয়াছিলাম। তল্লাস করিয়া দেখ। উক্ত গাইন সেই কাঁটা অরগুলায় নাদির সহিত পাইয়াছে। তৎপরে সে বলিল;—তোরঙ্গ খোল, আমার রেশমী কাপড় আছে কি না দেখি। তোরঙ্গ খোলা হইলে রেশমী কাপড় দেখিয়া ঐ মেয়েটী প্রকাশ করিল,—আমার কাপড়ের এক জায়গায় ছেঁড়া ছিল, কিন্তু দুই জায়গায় হইল কেন? তখন তদন্তে দেখা গেল যে, তাহার বধূমাতা পরিয়া অপর স্থান ছিঁড়িয়াছে। সে তাহার পুত্রদিগকে ও অন্য অন্য আত্মীয়দিগকে চিনিল ও তাহাদের নাম ধাম প্রকাশ করিল। একটী স্ত্রীলোক বলিল, আমি তোমার কে ছিলাম বল দেখি? সে বলিল, তুমি একদিন খেতে না পাইয়া আমার কাছে কিছু খাইতে চাহিলে। আমি তোমাকে সন্ধ্যাকালে এক পালি চাউল দেওয়াতে তুমি আমাকে ধর্ম্মমাতা বলিয়াছিলে, এখন আমাকে চিনিবে কেন? রামসাধন গাইন বলেন যে, এখন আমার বয়স ৪৫ বৎসর হইয়াছে, আর তোমার বয়স ১১ বৎসর; আমার কি বিবাহ করা উচিত? মেয়েটী বলে, তোমার অবর্ত্তমানে ছেলেরা আমাকে ভরণপোষণ করিবে, তোমার কোন চিন্তা নাই। সে হাল পিত্রালয়ে যাইতে চাহে না এবং হাল পিতামাতাকে মাসী ও মেসো বলিয়া থাকে। তাহারা তাহাকে জোর করিয়া উক্ত গাইনের বাটী হইতে লইয়া গেল। এক্ষণে রামসাধন গাইনের বিবাহ করিতে মত হইয়াছে। শীঘ্র বিবাহ হইবে।

(২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ হইতে উদ্ধৃত।)

এ ঘটনা অনেকে অবিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ জাতিস্মর (১)-ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। বহুকাল হইল, একদা এক শীর্ণকায় মুমূর্ষু ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রামের কোনও যোগীজাতীয়া নারীর কুটীরে আসিয়া অন্ন খাইতে চাহিলেন। যোগীরা হেয় জাতিমধ্যে গণ্য, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য থাকায়, সে

(১) 'জাতিস্মর'—যে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করে।

কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ নাছোড়বন্দা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, মা! আমার অসাধ্য হাঁপানি কাসের পীড়া। প্রায় বিশ বর্ষ এ পীড়ায় ভুগিয়া এক্ষণে মুমূর্ষু দশায় উপনীত হইয়াছি। আমার বাটী নবদ্বীপে। আর যাতনা সহিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিব স্থির করিয়াছিলাম। এই ভীষণ সঙ্কল্প করিয়া একবার জন্মের মতন ভগবান্‌কে অতি কাতর কণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে সংজ্ঞাহীন হই। সে সময় প্রত্যাদেশ হইল, অমুক স্থানে অমুক যোগী-জাতীয়া বৃদ্ধাই পূর্ব্ব জন্মে তোমার মা ছিলেন। তুমি রাগান্ধ হইয়া তাঁহায় নিগ্রহ করায়, এজন্মে এ রোগযাতনা ভুগিতেছ। তুমি যদি তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিয়া, তাঁহার পাতের প্রসাদায় নির্ব্বিকারচিত্তে ভোজন কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা কর, তবে তোমার ব্যাধির শান্তি হইবে। তাই মা! আমি তোমার চরণে শরণাগত। কৃপা করিয়া আমাকে প্রসাদ দিয়া আমাকে এ সাংঘাতিক রোগযাতনা হইতে মুক্ত করুন। বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ কাতর স্বরে তাহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন বৃদ্ধা নিরুপায় হইয়া, কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য গ্রামস্থ দশজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায়, সকলেই একবাক্যে, ব্রাহ্মণকে উচ্ছিষ্ট দিতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ অম্লানমুখে প্রফুল্লচিত্তে বৃদ্ধার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেন। সকলেই দেখিয়াছেন তদবধি ব্রাহ্মণের সে কাসরোগ নির্ম্মূল হইয়াছিল।

মহাকবি সেক্ষপীয়ার সত্যই বলিয়াছেন ;—স্বর্গ-মর্ত্ত্য-মধ্যে এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহা মহাদার্শনিক পণ্ডিতগণেরও কল্পনাতীত।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

সাধ।

সাধগুলি আজন্মের একান্তে বহিয়া,
সুখভোগ্য ফলসম শির নোয়াইয়া—
উৎসর্গ দিলাম প্রভো! তোমার উদ্দেশে,
তব নামাবলী গায়ে রহিনু বিদেশে।
পশ্চিমে আশার রবি ডুবেছে যখন,
স্মৃতির সুবর্ণ দ্বীপে করিব বরণ।
সেই শুভ্র পারিজাত-কলি সুশোভন
নিস্তব্ধ নিশীথযোগে নয়ন-আসারে
ধৌত করি লব শুধু তব পূজা তরে।
অর্ঘ্য লব হাতে তুলে প্রভাতিপূজার,
হৃদে বিরাজিবে শুধু তুমি নির্ব্বিকার ;
ধ্যান-অনিমেষ নেত্রে চাব তব পানে,
অসহ্য জীবন-বোঝা সঁপিব চরণে।

LIFE MOTTO.

কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা তখনি সাধিব তাহা,
এই মূল মন্ত্র এই ত সাধনা,
জপ তপ ইষ্ট কল্প কিছুই জানি না।
ক্ষুদ্র কি মহৎ কাজ বিধির বিধান,
এই ভাব হৃদে লয়ে চলিছে চরণ,
সংসার উষর পথে তাঁরি কার্জি বলে
সকলি করিব লাভ নির্ভয়েতে চলে
বৈতরণী ওপারেতে ভয় নাই মনে,
রেখেছেন স্থান প্রভু ঐ শ্রীচরণে।

চোখ গেল।

নাহি রে দিবস নিশা নাহি দুপহর,
মাতায়ে জগৎখানি কাঁপায়ে অম্বর,
পাতার আড়ালে থাকি, কেনরে লুকায়ে পাখি?
ব্যাকুল করুণে হেন শুধু নিরন্তর,
চোখ গেল বলে পাখি ডাকিস্ সুন্দর!
কোথা পেলি এই ডাক বলরে আমায়,
কে দিয়াছে এত দুঃখ বেদনা তোমায়.
ও কোমল প্রাণে তোর, এত কি বিষাদ ঘোর?
কি ব্যথা লুকান আছে ও ক্ষুদ্র হিয়ায়।
এমন অধীরে যাহে ডাকিছিস্ হায়!
মধুর বসন্ত এসে সবারে হাসায়,
দুঃখের এ ধরাখানি সুখে ভেসে যায়।
দোলে লতা তরুকোলে, ফুলেরা পড়িছে ঢলে,
হাসিয়া, সাজিয়া নব পল্লব-ভূষায়।
তোরি সাথী পিকবধূ মধু ঢেলে গায়।
ওই এক কথা তোর শুধু নিশিদিন,
ও মরম-কথা তোর নহে তো নবীন।
কত না বরষ এল, কত যুগ চলে গেল,
কালের প্রবাহে কত হইল বিলীন।
ও কথা রহিল শুধু তোর চিরদিন।
বলরে অবোধ পাখি! বল্ মোরে বল,
কে তোর ব্যথায় ব্যথী এ ধরণীতল।
তোর এ দুঃখের গীতি, কাহারে শুনাস্ নিতি
কেঁদে কেঁদে কার কাছে কহিস্ কেবল,
কে তোর জগতে আছে বল ওরে বল?
চিরদিন এই সারা বিশাল ধরায়,
তোর ও দুঃখের কথা শুনে ত সবাই।
শুধু ও করুণ গান শুনিয়া আমারি প্রাণ
কেন রে আকুল এত উদাশ সদাই?
আমারি হৃদয় হেন কেন কাঁদে হায়?
কাঁদিস না আর পাখি! মোর কাছে আয়।
কি তোর বেদনা আছে কবি তা আমায়।
আমি রে ব্যথার ব্যথী হব তোর চির সাথী
অমনি রে তোর সাথে যেথায় সেথায়,
ছুটিয়া বেড়াব পাখি! আয় হেথা আয়।
চল্ যাই সেই দেশে লুকায়ে দুজন।
যেথায় বসন্ত চির মধুর নূতন।
নাহি কোন কোলাহল, পবিত্র সে নিরমল,
নীরবে নির্জনে তথা রহিব দু'জন।

চল যাই পলাইয়া সে মধু কানন।
এ বড় প্রাণের সাধ। পাখি রে আমার,
এদেশে কভু ত আমি আসিব না আর।
তুইও আসিবি না পাখি! দু'জনে সেথায়
থাকি,
বিভুগানে ঘুচাইব প্রাণের আঁধার,
চল সেই দেশে, হেথা থাকিস না আর।

শ্রীসরোজিনী দেবী।

বঙ্গবিধবার শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা।

আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই এক বাঁধা-গত আছে যে, বঙ্গবিধবার ন্যায় দুঃখময় বৃথাজীবন এজগতে আর নাই এবং বিধবা হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরাই ভাল। বিধবার জীবন দুঃখের সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে আমরা বৃথা জীবন কোনও ক্রমেই বলিতে পারি না। যাক্, এস্থানে তৎসম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে। এখন কথা হইতেছে ইহাই যে, কাহার দোষে সেই অশিক্ষিতা পরাধীনা বঙ্গবিধবার দুঃখের জীবন আরও অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠে, তাহা একবার কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? বিধবার অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণের তাহাদের প্রতি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অবিমৃশ্যকারিতাই কি অধিকাংশ স্থলে তাহাদের এই দুঃখ কষ্টের মূলীভূত কারণ নহে? যে স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, একটী সংসারানভিজ্ঞা পিতৃ-মাতৃহীনা বিধবা বালিকা দিবারাত্র ভ্রাতার সংসারে কিংবা শ্বশুরগৃহে প্রাণপাত করিয়া খাটিয়াও ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, শ্বশ্রূ, দেবর, ননন্দা প্রভৃতি কর্ত্তৃক তুচ্ছকারণে বা অকারণে সর্ব্বদা নানা প্রকারে উপেক্ষিতা, নিগৃহীতা ও বাক্যবাণে দগ্ধা হইতেছেন, সে স্থলে তাহাদের জীবন নিতান্ত হেয়। এই দুঃখে তাহারা যে মৃত্যু প্রার্থনা করিবে ইহা কিছু আশ্চার্য্যের বিষয় নহে। বস্তুতঃ ঐ সকল ক্ষেত্রে ঐরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। আবার যদি কোনও বয়স্থা বিধবাকে ৪।৫টী অপোগণ্ড শিশু সন্তান সহ উক্ত প্রকার ভ্রাতার সংসারে অথবা শ্বশুর-গৃহে যাইয়া আশ্রয় লইতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সেই লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার মাত্রা যে শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এ অবস্থায় অনেক স্নেহময় জনক-জননীকেও উক্তপ্রকার সন্তানবতী অনাথা কন্যার প্রতি বিরূপ হইতে দেখা যায়,—এদৃশ্য কিছু বিরল নহে। সুতরাং এস্থলে ইহাই বক্তব্য যে, বিধবার অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণের বিধবার প্রতিও অনেক কর্ত্তব্য আছে এবং এই কর্ত্তব্যপালনে তাঁহাদিগের যত অধিক পুণ্য, যশ

উপার্জ্জন এবং সমাজ ও সংসারের মঙ্গল সম্ভাবনা, এই কর্ত্তব্যলঙ্ঘনে ততোধিক তাঁহাদিগের নিন্দা, পাপসঞ্চয়, সমাজের ও সংসারের অমঙ্গল সম্ভাবনা। সেই কর্ত্তব্য কি কি, তাহাই এ স্থানে বিবৃত হইতেছে।

প্রথম কর্ত্তব্য, বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু একথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত উপহাস করিবেন ও বলিবেন যে, আমাদের হিন্দু বিধবাকে কি আবার ব্রহ্মচর্য্য শিখাইতে হয়, তাহারা তো ইহা আপনিই শিখে। সে কথা সত্য ও আমাদের পতিত ভারতভূমির পক্ষে তাহা একটী গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং প্রায় অধিকাংশ বিধবাগণই যে নিজ হইতেই চিরদিন হৃষ্টচিত্তে এই ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন সে দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কিন্তু অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে, যে, বর্ত্তমান কালে অনেক স্থানেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ধনি-গৃহের অনেক পিতা মাতা ও শ্বশুর শাশুড়ী এরূপ আছেন যে, তাঁহারা অতিরিক্ত স্নেহের বশীভূত হইয়া, বালিকা এমন কি যুবতী বিধবা কন্যা বা বধূকেও ব্রহ্মচারিণীর পরিবর্ত্তে বিলাসিনী সাজাইয়া রাখেন। এবং খাদ্যাদির বিষয়েও তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যা-নুযায়ী প্রায় কোন নিয়মই পালন করিতে দেন না। অধিকন্তু ঐ সকল যে ভ্রান্ত-শাস্ত্র ও নির্দ্দয় দেশাচার ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা তাঁহাদের স্ব স্ব হৃদয়ে যেরূপ ধ্রুব বিশ্বাস, তদনুরূপ অপরকেও তাহা বুঝাইতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের এই স্নেহাতিশয্যের ফল পরিণামে যে কিরূপ বিষময় হইবে তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না। উক্ত বিধবাদিগের মধ্যে যেরূপ সংযম ও ধর্ম্মশিক্ষার অভাব, পক্ষান্তরে তেমনই বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রাদুর্ভাব। সুতরাং ঐ সকলে উত্তরোত্তর তাহাদিগের লালসা বৃদ্ধি পাইয়া তৎসঙ্গে হৃদয়ে নানা-রূপ কুপ্রবৃত্তি আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে ; পরে তাহাদিগের যখন শাসনের কাল উপস্থিত হয়, তখন শত চেষ্টাতেও আর ঐ সমুদায় হইতে নিবৃত্তি করিবার উপায় থাকে না ; এবং অধিক জোর জবরদস্তী করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠে। হয় কুলত্যাগ, নয় ত আত্মহত্যা,এই দুয়ের এক পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা কুলে কলঙ্কলেপন করিতে ঘৃণা বোধ করে না। এ দৃশ্য বিরল নহে। কিন্তু অনেক বালবিধবাকেও আবার পিতা-মাতা ও আত্মীয়বর্গের ঐ সকল স্নেহা-ত্যাচার হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া আজীবন পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া নিষ্পাপ ভাবে জীবন যাপন করিতে দেখা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ বিধবাগণের অধঃপতনের একমাত্র কারণ কি তাহাদের অভিভাবকগণ নহে ?

আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে যে সমুদায় বিধি পালনের ব্যবস্থা আছে, ভাবিয়া দেখিলে তৎসমুদয় পালনে বিধবার কি শারীরিক, কি

মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, কি সামাজিক সকল বিষয়েই উন্নতি ব্যতীত যে অবনতির আদৌ সম্ভাবনা নাই, বরং উক্ত বিধিসমূহ-লঙ্ঘনেই যে বিধবার শারীরিক মানসিক প্রভৃতি বিষয়ে সমূহ ক্ষতিসাধনই হইয়া থাকে, তাহা হিন্দুসমাজ-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন। কিন্তু মন্বাদি ঋষিগণের শাস্ত্রগ্রন্থের সমুদায় বিধিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা যে মনুষ্যের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদের ভারতময় কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাব্রতধারিণী মানবীদেবী রাণী শরৎসুন্দরী যে সে অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আমরা, অবশ্য অতদূর কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী নহি, তবে ইহাই বলিতে চাই যে, আমাদের দেশে চলিত বিধি এবং ঐ সকল বিষয়ে যতদূর শাস্ত্রীয় বিধি মানিয়া চলা যাইতে পারে, বিধবার পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য। বালিকা বিধবাও যদি স্বেচ্ছাক্রমে নিজ হইতে ব্রহ্মচর্য্যানুযায়ী সমুদায় বিধিগুলি পালন করিতে চাহে, তাহাও তাহাকে করিতে দেওয়া উচিত ও তাহাতে সর্ব্বতোভাবে তাহাকে সাহায্য করাই উচিত। তাহাতে অন্তরায় হওয়া কোনক্রমেই আমাদের যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যে সকল বালিকা ব্রহ্মচর্য্যের কিছুই বোঝে না (অর্থাৎ নিতান্ত বালিকা), এবং উক্ত সমুদায় বিধি অনুসারে চলিতেও চাহে না, অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ! তোমাদের মিনতি করি, তোমরা সেরূপ বালিকাকে ব্রহ্মচর্য্য শিখাইতে যাইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র স্কন্ধে ঐ বৃহৎ ভার চাপাইয়া দিয়া তাহাদের বালিকাজীবনের সুখটুকু কাড়িয়া লইও না। উহাতে বালিকার উপর বড়ই অত্যাচার করা হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে কোনক্রমে বিলাসের পথে যাইতে দিও না, বরং পার ত্যে তাহাদিগকে ঐ সকল হইতে শত হস্ত দূরে রাখিয়া উহা যে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য এই বিশ্বাসটী তাহাদের কোমল প্রাণে গাঁথিয়া দিও। ক্রমশঃ বালিকার বয়োবৃদ্ধির সহিত অতি সাবধানে ও ধীরে ধীরে তাহার জীবনের গতি সম্বন্ধে তাহাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা কর এবং তৎসঙ্গে রাণী ভবানী, শরৎসুন্দরী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া, আদর্শ বঙ্গবিধবাগণের উদাহরণ দেখাইয়া ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা ও উপকারিতা অতি সরল ও মিষ্টভাষায় তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দাও। দেখিবে, ক্রমে ক্রমে তাহারা সবই বুঝিতে পারিবে এবং আপনা হইতে ব্রহ্মচর্য্যের পথে অগ্রসর হইবে। আক্ষেপের বিষয় যে, বর্ত্তমান কালের অনেক যুবতী, এমন কি প্রৌঢ়া বিধবাকেও ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে নিতান্ত উদাসীনা দেখা যায়; অর্থাৎ দেশ-চলিত নিতান্ত যাহা পালন না করিলে লোকতঃ দোষী হওয়া মনে করেন, কেবল তাহারই কতিপয় বিধি মাত্র পালন করিতে দেখা যায়। তাহাও বিধাতা, শাস্ত্র ও দেশাচারের প্রতি

অজস্র অভিসম্পাত বর্ষণপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখ ও দায়গ্রস্ত হইয়াই যেন করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রেও বিধবার অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণের নিশ্চেষ্ট থাকা কিম্বা তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা বা অশ্রদ্ধার ভাব দেখাইয়া কটু কাটব্য ও জোর জবরদস্তী করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ সকলে প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। বরং শ্রদ্ধা ও মিষ্ট ব্যবহারে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বালিকাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকেও ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা, উপকারিতা ও উহা লঙ্ঘনের অপকারিতা বিষয়ে বেশ করিয়া বুঝাইয়া উক্ত সকলে প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করা উচিত। অধিকাংশ স্থলেই কর্কশ ব্যবহার অপেক্ষা মিষ্ট ব্যবহারই যে অধিক ফলপ্রদ হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। কি উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকারগণ বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারই কিছু কিছু এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

মৎস্য মাংস উত্তেজক সামগ্রী; পলাণ্ডু, রশুন, মসুরির দাইল, এগুলি অত্যন্ত গরম দ্রব্য, ইহা সেবনে শরীরের উষ্ণতা অতিবৃদ্ধি করে, তজ্জন্যই শাস্ত্রকারগণ পলাণ্ডু, রশুন ও মসুর দাইলকে ভারতীয় গোমাংস আখ্যা দিয়াছেন। গরম ও উত্তেজক দ্রব্য সেবনে ক্রোধ, লোভ, মত্ততা প্রভৃতি মানবদেহের নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি প্রবল হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের বহু বিঘ্ন ঘটায়। সুতরাং উক্ত সকল কারণ বশতই বোধ হয় গরম ও উত্তেজক দ্রব্য মাত্রেই ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীদিগের প্রতি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্যের বিধি আছে। পরিধান সম্বন্ধেও তাহাই, অর্থাৎ যে সমুদায় দ্রব্যে বিলাসিতার তিলমাত্রও গন্ধ আছে, তাহাও ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীদিগের প্রতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। যেমন তাম্বূলসেবন, গন্ধদ্রব্য লেপন, উত্তম বস্ত্র পরিধান, কেশরচনা, অলঙ্কার ধারণ, কোনও উচ্চ স্থান অর্থাৎ খাট পালঙ্গাদি বা কোমল শয্যায় শয়ন, চৌকী, কেদারা প্রভৃতি উচ্চাসনে উপবেশন, নৃত্যগীতাদি দর্শন, এমন কি ধর্ম্মকার্য্য ব্যতীত অপর কোনও উৎসবাদিতে যোগ দেওয়া বিধবার পক্ষে বারণ আছে। বিলাসকর দ্রব্যের ব্যবহার ও তৎসংঘটিত উৎসবাদি দর্শনে বিধবার সংযম নষ্ট হয় ও লালসা বৃদ্ধি পাইয়া হৃদয়ে নানারূপ কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইবার সম্ভাবনাতেই যে উক্ত সকল বিষয়ে ঐরূপ কঠোরতাবলম্বনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। একাদশীর উপবাসে শরীরের রস ক্ষয় হয় ও তৎকারণে রিপু সকল প্রশমিত থাকে বলিয়াই একাদশীর বিধি আছে। আচার, নিয়ম, নিষ্ঠা, গঙ্গাস্নান, দান, ব্রত, পূজা ও জপতপাদি পালনে সংযম শিক্ষা এবং হৃদয়ের পবিত্রতা ও উচ্চভাবসমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মানবের পারমার্থিক পথকে সুগম করিয়া দেয়। তৎকারণেই বিধবার প্রতি ঐ সকল প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ধর্ম্ম

ও সদাচারে যেমন ক্রমশঃ মানবকে স্বর্গের পথে লইয়া যায়, তেমনি অধর্ম্ম ও অসদাচারে ক্রমশঃ মানবকে নিরয়গামী করে। সুতরাং উক্ত সমুদায় হইতে ইহাই স্পষ্ট রূপে অনুভব করিতে পারা যায় যে, যাহা কিছু প্রবৃত্তিমূলক কার্য্য অর্থাৎ ঐহিক. তাহাই বিধবার পক্ষে অবিধি, এবং যাহা কিছু নিবৃত্তিমূলক কার্য্য অর্থাৎ পারত্রিক, তাহাই বিধবার পক্ষে বিধি। একমাত্র কঠোর সংযম ও সৎকর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই বিধবাজীবনের শ্রেষ্ঠতা ও চরম উদ্দেশ্য।

এক্ষণে অভিভাবকগণের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কার্য্য হইতেছে,—বিধবাদিগকে আধ্যাত্মিক বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞানবতী করা। প্রাচীনাগণের মধ্যে পূজা, ব্রত, নিয়ম. উপবাস, গঙ্গাস্নান, সদাব্রত, তীর্থদর্শন, ধর্ম্মকথা পাঠ ও শ্রবণপ্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্যোপযোগী আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মকার্য্যসমূহের প্রচলনাধিক্যে এবং তাঁহাদিগেরও ঐ সকলের প্রতি গভীর ভক্তি বিশ্বাস থাকায়. বিধবাগণ সর্ব্বদা উক্ত কার্য্যাদিতে ব্যাপৃতা থাকিয়া পরমানন্দে ও নির্ব্বিঘ্নে কালক্ষেপের অবসর পাইতেন। আরও বিস্ময়ের বিষয় ইহাই যে, তৎকালে ব্রহ্মচর্য্যের উক্ত বিধি ও ব্রতনিয়মাদি পালন পক্ষে প্রায়ই বালিকা ও বৃদ্ধাগণের মধ্যে পার্থক্য ছিল না। অধিক দিনের কথা নহে, আমাদের পিতামহী মাতামহীদিগের কালের সপ্তম অষ্টম বর্ষীয়া বিধবারও স্বেচ্ছাক্রমে ও অম্লানবদনে একাদশীর নিরম্বু উপবাস পালনের কথা শুনা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব অথবা কালের পরিবর্ত্তন, যে কারণেই হউক, ঐ সকলের প্রতি গাঢ় ভক্তি বিশ্বাস না থাকায়, আমাদের সমাজ হইতে ক্রমশঃ ঐ সকল নিয়মাদি উঠিয়া যাইতেছে, সুতরাং ঐ সকল স্থলে উক্ত বালিকা ও,বয়স্থা বিধবাগণ কি লইয়া দিন যাপন করিবেন? এবং এ ক্ষেত্রে তাহাদিগের কিছু শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না? দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষ ও রমণীগণ তাহা একটু বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। দরিদ্র ও গৃহস্থঘরের বিধবাগণ তবুও সদাসর্ব্বদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, সুখে হউক দুঃখে হউক, এক প্রকারে দিন কাটাইতে পারেন। কিন্তু ধনিগৃহের বিধবাগণ কি লইয়া দিন কাটাইবেন? তাঁহাদিগের মধ্যে এক দিকে যেমন গৃহকর্ম্মের অভাব, অপর দিকে তেমনই তাঁহাদিগের নিকট শত শত প্রলোভনের দ্বার উন্মুক্ত। সৎ হউক কিম্বা অসৎ হউক,কর্ম্মব্যতিরেকে মানবের জীবন ধারণ অসম্ভব, তৎকারণেই অধিকাংশ স্থানে ধনিগৃহের বিধবাদিগের মধ্যেই নৃত্যগীত দর্শন, তাশ খেলা, দিবা নিদ্রা, পরচর্চ্চা প্রভৃতির বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অনেক বিধবা আবার অতিরিক্ত নিষ্ঠাবলম্বনে এতই কঠোরাচার (শুচিবাই) সম্পন্না হইয়া পড়েন যে, তজ্জন্য নিজেরাও যেরূপ সর্ব্বদা মনের অশান্তি ভোগ করিতে থাকেন এবং অপরকেও তদ্রূপ নানা অশান্তির মধ্যে ফেলেন। তাঁহাদিগের

জীবনের সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য সবই যেন ঐ আচারের (শুচিবাই) উপর প্রতিষ্ঠিত। সূতিকাগৃহগমন, অস্পৃশ্য জাতির স্পর্শের অবৈধতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের নিকট যেরূপ উৎকৃষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, জগতের অপর কোনও জাতির মধ্যেই বোধ হয় তদ্রূপ পাওয়া যায় না।

এই স্থানে উহার সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও একটী পল্লীগ্রামে এক ব্রাহ্মণবিধবার ১৪।১৫ বৎসরবয়স্কা একটী বালিকা কন্যা প্রসবান্তে জরবিকার রোগে আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশের প্রথানুসারে বালিকা তৎকালে সূতিকাগৃহের জনৈকা নীচজাতীয়া ধাত্রীর জিম্মাতেই থাকে। রোগ যখন প্রবলাকার ধারণ করিল, তখন গ্রামস্থ কতিপয় আধুনিক যুবকের পরামর্শক্রমে ডাক্তারও আসিল এবং ডাক্তার যথোপযোগী ঔষধ ও শুশ্রূষার ব্যবস্থাও করিয়া গেলেন, কিন্তু হায়! সূতিকাগারে যাইয়া সেই ঔষধই বা খাওয়ায় কে এবং রোগীর শুশ্রূষাই বা করে কে? সূতিকাগৃহের নিরক্ষরা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীনা সেই নীচজাতীয়া ধাত্রীর দ্বারা যে ঐ সকল কার্য্য হওয়া নিতান্তই অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ঔষধ ও শুশ্রূষাভাবে রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল, এবং বিকারের ঝোঁকে বালিকাটী যখন ক্রমাগত উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বারংবার মা! মা! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, তখন দয়াময়ী মাতা কি করিলেন, পাঠক একবার তাহা শুনিতে চাও কি? মাতা ঐ গৃহের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া, হরিনামের মালা জপিতে জপিতে বলিতে লাগিলেন,—"কি করিব মা! আমি বিধবা মানুষ, আমার ত ঐ ঘরে যাইবার যো নাই, গেলে যে আমার জাতিধর্ম্ম থাকিবে না।" এবংবিধ নানারূপ আক্ষেপ ও জ্ঞানবাক্য প্রয়োগদ্বারা কন্যার আশু রোগ-মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে ইহাই হইল যে, কেবল একমাত্র শুশ্রূষা ও যত্নাভাবেই বালিকাটী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া, নির্দ্দয় দেশাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল! কিন্তু তথাপিও মাতার জাতি ও ধর্ম্মনাশ-ভয়ে সূতিকাগৃহে যাইয়া কন্যার শেষ মুহূর্ত্তেও মুখে জলবিন্দু দিবার সাধ্য হইল না। হায় ভ্রান্ত দেশাচার! হায় রে কুসংস্কার! কবে তোমরা আমাদের দেশ হইতে একবারে দূরীভূত হইবে! কিন্তু ইহা আশ্বাসের বিষয় যে, উক্ত সূতিকাগৃহের বিচারের বাড়াবাড়ি আজ কাল আর অনেক স্থানে দেখা যায় না; তত্রাচ এখনও যে আমাদের সমাজের অর্দ্ধাংশেরও অধিকের মধ্যে উক্ত প্রকার বিচারবাহুল্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ, ঐ সকলের মূলেই কি একমাত্র কুসংস্কার নাই? এবং তাহার মূলোৎপাটন কি একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সম্ভবে না?

সুতরাং, অভিভাবকগণ! তোমরা শিক্ষা

হইতে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত রাখিও না। কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য্যপালন ও গৃহকর্ম্মের জন্যই বিধবাজীবন নহে। তাহাদেরও এ জগতে অনেক জানিবার, শিখিবার ও করিবার আছে। সৎশিক্ষার দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত করিয়া দাও ত দেখিবে সে জীবনের মূল্য কত অধিক হইবে এবং তাহাদের জীবনও যে বৃথাজীবন নহে এবং তাহাদের দ্বারা যে জগতের অনেক মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহা তখন অক্ষরে অক্ষরে বুঝিতে পারিবে। তখন দেখিবে, তাহারা গৃহ-কর্ম্মাবসরে যে সময় গল্প-গুজবে কাটাইত, সেই সময় জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনায় অতি-বাহিত করিবে। অধিকন্তু ঐ সকলকে আন্তরিক ঘৃণা করিতে শিখিবে। সুতিকা-গৃহগমন, হীনজাতির সেবা, এমন কি তাহাদের স্পর্শেও, যে বিধবার জাতিধর্ম্ম-ক্ষয় হয়, এবংবিধ শত শত কুসংস্কারের হস্ত হইতে তাহারা সদাই মুক্ত থাকিবে। অধিকন্তু উহাই যে প্রকৃত ধর্ম্ম, এবং ঐ সকল কার্য্যসম্পাদনেই যে, ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য সাধন করা হয় ও উহাতেই যে নারী-জীবনের সার্থকতা, তাহা আর তাহাদের বুঝিতে বাকি থাকিবে না। বস্তুতঃ যতই তাহাদের উক্ত কর্ত্তব্য সমুদায় গভীররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকিবে, ততই তাহাদিগের প্রাণ ঐ সকল সৎকর্ম্মসাধনার্থে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। তখন আর সে জীবন হেয়, ব্যর্থ ও দুঃসহ বলিয়া বোধ হইবে না। বঙ্গবিধবার শিক্ষার কথা শুনিয়া পূর্ব্ব-সংস্কার বশতঃ হয়ত অনেকেই শিহরিয়া উঠিবেন, এবং হাড়ে হাড়ে চটিয়া যাইবেন; কিন্তু তোমরা ভয় পাইও না, এ শিক্ষায় তোমাদের সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ব্যতীত অবনতির আদৌ সম্ভাবনা নাই। আমরা তাহাদিগকে স্কুল কলেজে দিয়া অথবা মাষ্টার পণ্ডিত রাখিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভূষিতা করিয়া পাশ্চাত্যভাবাপন্ন করিবার কথা বলিতেছি না। যে শিক্ষায় বিধবার ব্রহ্মচর্য্যকে অটুট রাখে, মাতৃত্বের বিকাশ হয়, তাহাদিগকে কর্ত্তব্যে প্রণোদিত করে এবং হৃদয়ের জ্ঞান ও ধর্ম্মভাবকে প্রস্ফুটিত করিয়া সর্ব্বপ্রকারে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর করিয়া দেয়, আমরা সেই শিক্ষার কথাই বলিতেছি। বিধবার শিক্ষা তাহাদের পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি নিতান্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ও স্ত্রী-লোকের দ্বারাই হওয়া উচিত, এবং আজকালকার এই শিক্ষাযুগে তাঁহারা যে বিধবা কন্যা বা ভগিনীর হিতার্থে একটু সামান্য চেষ্টা ও যত্ন করিলেই যে এটুকুও না করিতে পারেন, তাহাও নহে। কিন্তু হায়! আমাদের দেশের নরনারীর মধ্যে সে ইচ্ছা ও সে প্রাণগত চেষ্টা কোথায়?

(ক্রমশঃ)

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। কোনও স্থান ফুলিয়া বা ফোঁড়ার মত হইয়া পাকিবার উপক্রম হইলে, সেই স্থানে গোলমরীচ বাটিয়া তাহার প্রলেপ তিন চারিবার লাগাইলে একদিনের মধ্যেই আশ্চর্য্যরূপ উপকার পাঁওয়া যায়।

২। গলায় কিম্বা অন্য কোনও স্থানে বিচি নামিয়া যন্ত্রণা হইলে, সেই স্থানে সমুদ্রের ফেনা ঘসিয়া প্রলেপ লাগাইলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে যন্ত্রণার উপশম হয়।

৩। ফোঁড়া বা ঐরূপ বিচির স্থানে ভয়ানক জ্বালা ও যন্ত্রণা থাকিলে সমুদ্রের ফেনা, হুকার জল ও ঘুঁটের ছাই একত্র ঘসিয়া তাহার প্রলেপ লাগাইলে, সেই স্থানের বিষ কাটিয়া গিয়া অচিরে তাহা আরোগ্য হয়।

নূতন সংবাদ।

১। বিগত ২৬শে মার্চ্চ শনিবার, প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ভুবনেশ্বরে আগুন লাগিয়াছিল। তাহাতে সমুদায় সহর ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। শোনা যায়, ভুবনেশ্বর মন্দির ব্যতীত সহরে আর কিছুই নাই।

২। সিসিলির পূর্ব্বদিগবস্থিত এট্না আগ্নেয়গিরিতে ভয়ানক অগ্ন্যুদ্গম আরম্ভ হইয়াছে। এই পর্ব্বত প্রায় ১০,৭০০ (দশ হাজার সাতশত ফিট) উচ্চ।

৩। লেডী মিণ্টোকে উপহার প্রদান—বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রীরা সকলে মিলিয়া লেডী মিণ্টোকে একটী আতরদান উপহার দিয়াছেন। লেডী মিণ্টোও সকলকে সাদর সম্ভাষণে সুখী করিয়াছেন।

৪। মূকবধিরবিদ্যালয়—স্যার এড্‌ওয়ার্ড বেকার মূকবধিরবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শিল্পশিক্ষার জন্য আড়াই শত টাকা দান করিয়াছেন।

৫। ডাকে বালক প্রেরণ—স্কটল্যাণ্ডে গ্ল্যাসগো নগরে এক রমণী একটী বালককে ডাকযোগে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছেন। ডাকে মানুষ পাঠান এই নূতন।

৬। ভারত ভ্রমণ—আমেরিকা হইতে প্রায় ১০০ ভ্রমণকারী ভারতে ভ্রমণ করিতে আসিতেছেন।

৭। রাজ্ঞীর সমাধি-সংস্কার—বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ রাজ্ঞী নুরজাহানের সমাধি-সংস্কারের জন্য ৫০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৮। লেডী বেকারের নেতৃত্বে কলিকাতার য়ুরোপীয় ও ভারতীয় ৩৫০টী মহিলা মিলিত হইয়া, লেডী মিণ্টোকে একটী বহুমূল্য হীরকের ক্রচ উপহার দিয়াছেন।

৯। নারীসম্মিলন — কলিকাতার ইউরোপীয় ও ভারতীয় নারীদিগের মধ্যে সখীত্ব সংস্থাপনের জন্য কয়েকবার নারী-

সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। একদিন হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার লরেন্স জেঙ্কিন্সের সহধর্ম্মিণী লেডী জেঙ্কিন্স আপনার গৃহে নারীসম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং শাড়ী পরিয়া এবং পা হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত মল, বালা, তাগা, হার, সিঁথি প্রভৃতি নানা প্রকার অলঙ্কারদ্বারা সজ্জিত হইয়া নিমন্ত্রিতা মহিলাদিগের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। পরস্পরের চিত্তবিনোদনের জন্য ইংরাজমহিলাগণ নানা প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী মহিলাগণও কেহ কেহ রতি, কেহ ভৈরবী, কেহ মহারাষ্ট্রীয়বেশে, কেহ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কেহ বা তুরস্করমণীর পরিচ্ছদে গমন করিয়াছিলেন। লেডি মিণ্টো এই ক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিলেন। ডাক্তার পি. কে. রায়ের বাটীতে এবং কুচবিহারের মহারাজের বাটীতে আরও দুই দিন এই নারীসম্মিলন হইয়াছিল।

১০। লেডি মিণ্টোর কাশী গমন— লেডী মিণ্টো কাশীতে যাইয়া তথাকার ঘাটসমূহ ও অন্নপূর্ণার আরতি, বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি দর্শন করিয়াছেন।

১১। প্রাচীন মুদ্রা - পোর্ত্তুগাল, লিসবনের কোলমিনা নামক স্থানের এক প্রাচীন দুর্গ খুঁড়িতে খুঁড়িতে বিস্তর প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাগুলি স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজ।

১২। ট্রান্সভালপ্রবাসী ভারতবাসীদিগের সাহায্যকল্পে রেঙ্গুনে উনচল্লিশ হাজার তিন শত সাতার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে।

বামারচনা।

অশ্রু-গাথা।

১

সংসার খেলায় ভাই! পরিশ্রান্ত আজি,
বিশ্রাম লভিতে তাই অনন্ত শয্যায়,
ঢালিলে ও বরবপু—দীপ্তি-কান্তিরাজি,
অলসে মুদিলে আঁখি মহতী নিদ্রায়!

২

আর কি ও ঘুমঘোর ভাঙ্গিবে না ভাই!
জীবনের সব কার্য্য হল সমাপন?
ভবিষ্যৎ সুখ-আশা কিছুই কি নাই?
তরুণ বয়সে সব দিলে বিসর্জ্জন!

৩

হের ভাই, পাদপ্রান্তে অশ্রুবিগলিতা,
মূর্ত্তিমতী বিষাদিনী বিরহকাতরা,
অভাগিনী পত্নী তব ধূলিতে লুণ্ঠিতা,
হৃদয় তাহার আজি ভীষণ সাহারা।

৪

তরুর আশ্রয়-চ্যুত হইয়া কখন
নীরস কঠিন ভূমে রহে কি বাঁচিয়া,
লতিকার সুকোমল মধুর জীবন?
বাঁচাতে পারে কি কেহ সলিল সিঞ্চিয়া?

৫

মহান্ আশ্রয়-চ্যুত আজি যে বালিকা,
শোকের আতপতাপে পড়িছে ঢলিয়া,
বিষাদ-ঝঞ্ঝার আজি সাধের লতিকা,
কাহারে আশ্রয় করি রহিবে বাঁচিয়া?

৬

হের ভাই! ভূমিতলে কুসুমকোরক
'বাবা' বলি কাঁদিতেছে প্রাণের কুমার;
আজি যে নিবিল তার আশার আলোক,
এ জনমে অশ্রুজল মুছিবে কি তার?

৭

সপ্তম মাসের শিশু কোমল কলিকা
সাধের 'বিজয়া' আহা কত আদরের!
পিতার হৃদয়-কুঞ্জে সুরম্য যূথিকা,
হাসি-মুখে এসেছিল গৃহে আমাদের।

৮

বুঝেনা অবোধ শিশু, কি যে হাহাকার
তুলিয়াছে গৃহে পশি তস্কর শমন,
আনন্দ-উজ্জল গেহ করি অন্ধকার,
চুরি করি লইয়াছে মহার্ঘ্য রতন।

৯

মনে পড়ে আজি ভাই! শৈশবের কথা,
সুকুমার জীবনের আশা ও কল্পনা।
কালের আবর্ত্তে হায়! ছিন্ন জীবলতা,
অতৃপ্ত রহিল সব আকাজ্ক্ষা কামনা।

১০

বুঝিতে পারি না ভাই! রহস্য ধাতার!
অকালে ধরণী হতে লইয়া তোমায়,
কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হইল তাঁহার?
এ গূঢ় কাহিনী বলে কে দিবে আমায়?

১১

ভুলিতে পারি না তব সদ্‌গুণরাশি,
উদার প্রাণের সেই নম্র ব্যবহার,
করুণায় বিভাসিত সদা হাসি হাসি
অনিন্দ্য সুন্দর মুখ সুষমার সার।

১২

যাও ভাই! স্বর্গধামে জনকের পাশে,
স্নেহময়ী জননীও আছেন সেথায়।
আমরা জীবন ধরি রব কোন আশে?
অনল শয্যায় আজি বিসর্জ্জি তোমায়।

শোকসন্তপ্তা ভগিনী
শ্রীমতী সরলা মিত্র।

জননী আমার!

১

তুমি স্বরগের দেবী,
ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা-ছবি,
সরলতা প্রীতিময়ী
মূর্ত্তি করুণার!
স্বরগের দেবী তুমি
জননী আমার।

২

জননী আমার—
সংসারের কোলাহল

স্পর্শে না ও হৃদিতল,
আপনার ভাবে সদা
আপনি বিভোর ;
প্রীতিময়ী দেবী তুমি,
জননী আমার !

৩

জননী আমার !
তোমার স্নেহের কোলে
সব দুঃখ যাই ভুলে,
জ্বালাময় সংসারের
অশান্তির ভার !
শান্তিময়ী দেবী তুমি,
জননী আমার !

৪

জননী আমার !
এ সংসার মরুভূমি,
শান্তিবারি তাহে তুমি,
শান্তিহীন হৃদয়েতে
ঢাল স্নেহধার !
প্রেমময়ী দেবী তুমি,
জননী আমার !

৫

জননী আমার !
সংসারে আসক্তিহীন,
নিজ সুখে উদাসীন,
সংসারের কর্ত্রী হয়ে,
কি আছে তোমার !
উদাসীনা দেবী মাগো !
তুমি যে আমার।

৬

জননী আমার !
সীমন্তে সিন্দুর পরি,
উদাসীন বেশ ধরি,
মুখে ফোটে স্বর্গজ্যোতিঃ,
জ্ঞান প্রতিভার !
সর্ব্বজীবে দয়াময়ী,
তুমি মা আমার !

৭

দেবী গো আমার !
নিজ স্বার্থ বলি দিয়ে,
নিঃস্বার্থ সাধনা লয়ে,
সাধ্বী পতিব্রতা দেবী,
মূর্ত্তি করুণার !
দেবীরূপী তুমি যে গো,
জননী আমার !

৮

জননী আমার !
তোমার আদর্শ লয়ে,
দিনগুলি কাটাইয়ে,
যেতে যেন পারি মাগো !
অনন্তের পার।
ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা ছবি,
জননী আমার !

৯

জননী আমার !
কত সাধনার ফলে
জন্মেছি ও স্নেহকোলে,
স্নেহ-ক্রোড়ে মাথা রেখে,
ভুলি গো সংসার !

প্রেমময়ী দেবী তুমি
জননী আমার!

১০

জননী আমার!
যেওনা মা! আগে চলে,
দীনা তনয়ারে ফেলে,
জগদীশ চরণেতে
প্রার্থনা আমার!
শান্তিময়ী মাগো তুমি,
দেবী সাধনার।

স্মৃতি।

নিশীথের স্বপ্ন সম মনে হয় মোর,
এখনও মাঝে মাঝে সেই মুখখানি.
বহু দূরাগত, স্নিগ্ধ সঙ্গীতের মত,
এখনও শ্রবণে বাজে সেই আধবাণী।
সত্যই কি ছিলি তুই? অথবা স্বপন?
ভ্রান্ত মন কাটাইতে পারে না যে হায়!
এ প্রশ্নের কুহেলিকা, সত্যই কি তুই—
একদিন প্রাণাধিক ছিলি এ ধরায়?
ছিলি যদি সত্য তবে কেন নাই আজ,
তোর স্মৃতি সুখময় কেন জাগে প্রাণে?
হৃদয়ে জাগায়ে দেয় দারুণ বেদনা।
বুক-ফাটা অশ্রুবিন্দু ঝরে দু'নয়নে।
কেন এসেছিলি তুই? ছায়াটীর মত
হৃদয়ে আনিতে শুধু অগ্নিময় রেখা
আজীবন আমাদের দগ্ধ করিবারে
দু'দণ্ডের তরে কি রে দিয়েছিলি দেখা?
কখনো ছিলি না তুই প্রিয় সহোদর,
সেই ভাল স্বপ্নে আমি দেখেছিনু তোরে
এই চিন্তা সুখময় ছিলি নারে তুই,
স্বপ্নে শুধু দেখেছিনু দু'দণ্ডের তরে।
হায় রে সংসার! এর কিছু দিন আগে
সে নাকি আছিল মোর বুকভরা ধন,
আজি তারে স্বপ্ন বলে ভুলিবারে চাই,
অনুপম! তোর স্মৃতি স্বপন! স্বপন!

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন।

ওর তরে নয়।

(কোন অল্পবয়স্কা বিধবা দর্শনে।)

ওর তরে নহে হায় ফুলের সুবাস!
প্রস্ফুটন্ত ফুল-বধূ, উহারে দেয় না মধু,
বহেনা উহার লাগি মলয়-বাতাস।
উহারে শুনাতে অলি গাহে নাতো গান,
বিহঙ্গ উহার লাগি, উষায় উঠেনা ডাকি,
ওর তরে নহে স্নিগ্ধ নির্ঝরের তান।
শরতের আবছায়া, পদ্ম শত-আঁখি,
বসন্তের ফুলবন, বরষার গরজন
কিছু নয় ওর তরে, ও যে গো একাকী,
ওর তরে শুধু হায় মর্ম্মোত্থিত শ্বাস!
ওর তরে অবিরল, নয়নের অশ্রুজল
নিরাশ আঁধারে মগ্ন হৃদয়-আকাশ।

কেন মিছে আনন্দের কোলাহল-মাঝে
উহারে লইছ টেনে, হৃদয়ের এক কোণে
জান নাকি ভগ্নবীণা উঠিতেছে বেজে!
থাক্ নীরবেতে আহা নয়নের জলে!
সুখ দুঃখ এ ধরার, ও কিছু চাহেনা আর,
জীবনের সাধ আশা ডুবেছে অতলে।
সেই সুখ-স্মৃতিটুকু লয়ে অভাগিনী
বুকে লয়ে হাহাকার,চোখে কোরে অশ্রুধার
নীরবে কাটায়ে দিবে দিবস-যামিনী।

অমরার প্রতি।

আচম্বিতে এ মরুতে ফুটিলিরে ফুল!
প্রথমে ভাবিনু "একি বিধাতার ভুল?"
ফুটিলি ঢালিলি ফুল মাথা পবিত্রতা,
শুনালি মুমূর্ষু প্রাণে আশার বারতা,
বিধির আশীষ ফুল ধরা আলো করে,
ফুটে থাক মরুভূমে সৌরভ বিতরে।
তোর মুখ হেরে ভুলি যমের তাড়না,
শান্তি আসে এ পরাণে, সংসার-যাতনা
দগ্ধ হৃদি ছেড়ে যায়.—পাই শান্তি বল।
উজলা করিস ফুল! এ ভাবে ভূতল।
অতীত কাহিনী লেখা তোর হাসিমুখে।
কতই সান্তনা পাই এই মহাদুঃখে।
নির্ব্বাণ-উন্মুখ দীপে তৈলরূপী হয়ে,
স্বরগ-হিল্লোল দিলি সে প্রাণে বহায়ে,
ভগ্নবীণা ভেদি উঠে আশার সুতান
মুমূর্ষুর দেহে এলো নবীন জীবন।
সেই কথা ওরে ফুল! কেমনে ভুলিব?
অমরা-কুসুম তোকে সদা আদরিব।
ভগ্ন হৃদে দিস্ নিত্য শান্তিশীতলতা
বিচূর্ণ পরাণে শুনা ত্রিদিব-বারতা॥

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 560. April, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬০ সংখ্যা। { চৈত্র, ১৩১৬। এপ্রেল, ১৯১০। } ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কুক্কুরের অত্যদ্ভুত শক্তি—বোধ করি, অনেকেই জ্ঞাত আছেন, অধুনা দস্যু-তস্করাদির অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞান-কার্য্যে য়ুরোপের নানাস্থানে সুশিক্ষিত কুক্কুর সকল নিযুক্ত হইয়াছে। ঐ সকল সরমানন্দনের অত্যাশ্চর্য্য শক্তি! সম্প্রতি ভরোনেশ হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে,—পেভোলস্কি নামক স্থানে প্রিন্স ভাসিল্চকফ্ মহোদয়ের সম্পত্তি-রক্ষকগণের মধ্যে একজন কর্ম্মচারী হত হন। স্থানীয় লোক বা পুলিস বহু অনু-সন্ধানেও হত্যাকারীর সন্ধান করিতে পারিলেন না। তখন মস্কো নগরী হইতে বিখ্যাত ডিটেক্টিভ ট্রেফ নামক কুক্কুর আনীত ও হত্যাকারীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইল। সে অচিরেই নিজ ঘ্রাণশক্তি দ্বারা লোকের গাত্র ও পরিধেয়াদি আঘ্রাণ করিয়া প্রকৃত অপরাধীকে ধৃত করিল। একদা উক্ত কুক্কুর যে ট্রেণে যাইতেছিল, সেই ট্রেণের একজন আরোহীর, ৫০ পাউণ্ড মুদ্রাসহ পকেটবুক অপহৃত হয়। তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত কুক্কুরকে চোরধারণের জন্য নিযুক্ত করা হইল। সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যেক আরোহীর আঘ্রাণ লইতে লাগিল। তন্মধ্যে একজন ব্যক্তি সেই ট্রেণ হইতে ষ্টেসনে নামিয়া পরবর্ত্তী অন্য ট্রেণের এক কামরায় উঠিতেছিল। কুক্কুর তাহার নিকট গিয়া আঘ্রাণ লইবামাত্র তাহার কোট কামড়াইয়া ধরিল, তাহাকে আর এক পদও যাইতে দিল না। পশ্চাৎ দেখা গেল যে, তাহার গাত্রবস্ত্রের গুপ্তস্থানে ঐ ৫০ পাউণ্ড লুকান আছে। এই সকল কুক্কুরের এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার নিত্য-ঘটনা।

অপূর্ব্ব ব্যাপার—বানরের বিদ্যালয় —ইংলণ্ডের বিখ্যাত হামলিন সাহেব বহু কাল ধরিয়া বনে বাস করিয়া, বানরের ভাষা শিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পত্নী বিবি হামলিন্ বানর-বানরীকে বিদ্যা শিখাইবার জন্য বিলাতে একটী "বিশ্ব-বিদ্যালয়" খুলিয়াছেন। তাঁহার এই বিদ্যা-লয়ে বানরেরা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। বিলাতী আদব কায়দা বুঝিয়া বেশ সভ্য হইতেছে। এই সকল বানর বানরীদের ইংরাজী নামকরণও নাকি হইয়াছে। অর্থাৎ বিদ্বান্ বানর হইয়াছেন,—"মিষ্টার পিটার," বিদুষী বানরী হইয়াছেন,—"মিসেস মিজরী"। সাহেবের সখের স্কুল হইতে, এ পর্য্যন্ত ১৭টী শাখামৃগ সুশিক্ষিত হইয়াছেন। এখন তাঁহারা মাথায় হ্যাট্ দিতেছেন, গায়ে কোট আঁটিতেছেন, নাকে চসমা লাগাইতেছেন, পায়ে বুট পরিতেছেন, এবং মুখে চুরুট দিয়া সমাজে সদর্পে বিচরণ করিতেছেন! খানা খাইবার সময় কাঁটাচামচও চালাইতেছেন।

এই সকল বিদ্যালোকপ্রাপ্ত বানর-বানরী, পথ ভ্রমণে বাহির হইয়া, চায়ের দোকানে গিয়া পকেট হইতে পেনি বাহির করিয়া দোকানির হাতে দিয়া পেয়ালা-ভরা চা লইয়া পান করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে মিঃ পিটারই নাকি পণ্ডিত-কুলতিলক। তিনি সভ্যতায়, শিষ্টাচারে, বুদ্ধি-বিদ্যায়, সকলের শ্রেষ্ঠ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিজ গুণগৌরবে তিনি নিউইয়র্কের "প্যালেস" থিয়েটার হইতে মাসিক পনের হাজার টাকা মাহিনা পান।

শিম্পাঞ্জীশ্রেণীর বানরসম্প্রদায়, প্রাতে ৭টা ৮টার সময় শয্যা ত্যাগ করেন। তার পর সাহেবদের সঙ্গে ব্রেকফাষ্টের চেয়ারে বসিয়া সাহেব-বিবিদের অনুকরণে, কাঁটা চামচে ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করেন। ভোজন-শেষে—সাবান মাখিয়া স্নান করেন, চিরুণী ও ব্রস দিয়া চুল আঁচড়ান; পরে স্ত্রী শিম্পাঞ্জী মেমের গাউন পরেন, পুরুষ শিম্পাঞ্জী সাহেবের পোষাকে সুসজ্জিত হন।

প্রাতে বেশপরিবর্ত্তনের পর পথভ্রমণের পালা। মধ্যাহ্নে বাজনা বাজানো, কল চালানো, ও অন্যান্য কারুকর্ম্ম শিক্ষা করা। বৈকালে বিস্কুট ও চা খাওয়া, সন্ধ্যায় সকলের সঙ্গে শিষ্টভাবে বসিয়া সিদ্ধ মাংস, ও মৎস্য, স্বাদু ব্যঞ্জন, ব্রেড, শিককাবাব প্রভৃতি ষোড়শোপচারে নৈশ ভোজন!

সভ্য বানরগণ শয়ন করিতে যাইবার সময়, সাহেব-বিবিদের মত পরস্পরের মুখ চুম্বন করিয়া রাত্রিবাস পরিধানানন্তর স্ব স্ব পালঙ্কে শান্তভাবে নিদ্রা যান।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, মনু হইতে মানববংশের উৎপত্তি—আর্য্য ঋষির এ কথাটার চেয়ে 'বানর মানুষের প্রপিতামহ' ডারুইন ঋষির এই সিদ্ধান্তের মূল্যটাই বেশী।" ("নায়ক" হইতে এ সংবাদ লিখিত হইল)।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের উপদেশ।

(সন১৩১৩সালের বর্ষশেষ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে যে উপাসনা হয়, তদুপলক্ষে)

অদ্য চৈত্র-সংক্রান্তি—হিন্দুদিগের মতে জল-সংক্রান্তির দিন। এই দিনে ধর্ম্ম-বিশ্বাসী হিন্দুরা অতি শ্রদ্ধার সহিত কলস কলস জল উৎসর্গ করিয়া, পিতৃপুরুষ-দিগের তর্পণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন—পিতা-মাতা-আত্মীয় প্রভৃতি যাঁহারা মরিয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকেন; এই দিনের উৎসর্গীকৃত জল পাইলে তাঁহাদের পরম তৃপ্তি হয়, এবং বংশধরেরা মহা ঋণদায় হইতে মুক্ত হন, এই জন্য হিন্দু বংশধরগণ এক এক জন আত্মীয় প্রেতাত্মার নামে এক এক কলস জল উৎসর্গ করিয়া চিত্তের শান্তি লাভ করেন।

আমরা যদিও এরূপ প্রেততর্পণে বিশ্বাস করি না, কিন্তু বৎসরান্তে স্থির-চিত্তে আত্মচিন্তায় নিযুক্ত হইলে কি অনেক প্রেত মূর্ত্তি নিকটে নিকটে দেখিতে পাই না? বৎসরের শেষ দিন আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষার বিশেষ দিন। চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই, আমাদের যাহা ভাবা উচিত ছিল, তাহা ভাবি নাই; যাহা অনুচিত তাহা ভাবিয়াছি; যাহা বলা উচিত ছিল, তাহা বলি নাই; যাহা অনুচিত, তাহা বলিয়াছি; যাহা করা উচিত ছিল, তাহা করি নাই; যাহা অনুচিত তাহা করিয়াছি। —সংবৎসরে এইরূপ কত অপরাধ ও ত্রুটি করিয়াছি। এই অপরাধ ও ত্রুটির স্মৃতি, প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া থাকে, এবং দণ্ডের ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহাদিগের তর্পণ না করিলে চিত্তের শান্তি লাভ হয় না।

হিন্দুদিগের আর একটী বিশ্বাস, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, অঙ্গুলি প্রভৃতি যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা ইহজীবনে যে পাপাচরণ করা যায়, মৃত্যুর পর ধর্ম্মরাজের নিকটে সেই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাপীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করে; এবং তাহাকে তদনুসারে বিশেষ বিশেষ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। স্থূল হউক, সূক্ষ্ম হউক, দুষ্কৃতির ফলভোগ কেহ এড়াইতে পারে না।

আমরা যদি গভীররূপে চিন্তা করি, তবে এই কথার মধ্যে একটী মহাসত্য দেখিতে পাই। আমাদের পাপের সাক্ষী আমরা নিজেই? "মনের অগোচর পাপ নাই"। সংসারের কোলাহলে ও বিষয়ের ব্যস্ততায় আমরা হয়ত স্বকৃত পাপ কিছু কালের জন্য ভুলিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু আমাদিগের মনের স্মৃতিতে সে সকল নিহিত থাকে, এবং সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের হিসাব-পুস্তকে প্রতি মুহূর্ত্তের পাপ লিখিত

হইয়া থাকে। যখন নির্জ্জনে নিভৃতে স্মৃতির দ্বার খুলিয়া যায়, তখন পাপের স্মৃতি, এক একটা প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় সম্মুখীন হইয়া আত্মগ্লানির অনলে হৃদয় দগ্ধ করে। ঈশ্বরপ্রদত্ত মনোবৃত্তি, বাগ্‌যন্ত্র এবং শরীরের ইন্দ্রিয়সকলের অপব্যবহার দ্বারা আমরা যে সকল লজ্জাকর, ঘৃণাকর এবং জগতের অনিষ্ট-কর কর্ম্ম করিয়া আপনাদিগের আত্মাকে মলিন করি, তাহার স্মৃতি কোনও প্রকারেই আমরা মুছিয়া ফেলিতে পারি না। হৃদয়ের স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত হইয়া সে সকল সঞ্চিত থাকে এবং অবসর পাইলেই আমাদিগকে ঘোরতর উৎপীড়ন করে।

আর এক শ্রেণীর প্রেত,—আমাদের জীবনের অতীত মুহূর্ত্ত, দণ্ড, প্রহর, অহো-রাত্র প্রভৃতি। ইহারা জীবনের উন্নতি-সাধন জন্য ঈশ্বরের মহাদান। সময়ের সদ্‌ব্যবহার দ্বারা কত বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, মহত্ব ও দেবত্ব উপার্জন করা যায়। কিন্তু আমরা আলস্যে বৃথা আমোদ প্রমোদ বা অসদাচরণে এই সময়ের অপব্যবহার করিয়া আত্মহত্যারূপ মহা অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকি। এই সময়ের দণ্ড পল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ফরিয়াদী দলের ন্যায় খাড়া হইয়া মহাবিচারপতির নিকট আমাদের বিরুদ্ধে হত্যাপরাধের সাক্ষ্য দান করিয়া থাকে। তখন আত্মসমর্থনে আত্মাই অসমর্থ হইয়া কৃতাপরাধ স্বীকার করে, আর পাপের স্মৃতি সকল ভয়ঙ্কর পিশাচ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, শত শত নরকা-গ্নিকুণ্ডে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করে। আত্মগ্লানি-নরকাগ্নির ন্যায় দুঃসহ অগ্নি-জ্বালা আর নাই ;—দাবানল, বাড়বানল, ইহার নিকট সামান্য। কোন্ জলে এই আগুন নির্ব্বাণ হয়? কোন্ জল-সংক্রান্তির জলে পাপ-পিশাচদিগের তর্পণ হইতে পারে? করুণাময় পরমেশ্বর পাপীর সদ্গতির জন্য একমাত্র স্বর্গীয় পরম পবিত্র জলের ব্যবস্থা করিয়াছেন ;—ইহা অনু-তাপের অশ্রুজল। পাপী ত্রিতাপে তাপিত হইয়া ঈশ্বরের চরণের দিকে দৃষ্টি করিয়া যদি এই অশ্রুজল বিসর্জন করিতে পারে, ইহাতেই প্রেত সকলের তর্পণ হয়, এবং পাপীর হৃদয় পরম শান্তি উপভোগ করে। এমন পাপ নাই, অনুতাপের অশ্রুজলে যাহা ভাসিয়া না যায়।

পাপীর নয়নজলের সহিত ঈশ্বরের করুণাস্রোত প্রবাহিত হয় এবং তাহাতে অসাধ্য সাধন ও অসম্ভব সম্ভব করিয়া দেয়। যুগে যুগে মহাপাতকী জগাই মাধাই প্রভৃতি ইহাতেই উদ্ধার হইয়া গিয়াছে।

এস ভাই ভগ্নীগণ! বৎসরান্তে সংক্রান্তির দিনে এই অনুতাপ-অশ্রুজলে, আমাদের গতজীবনের অসৎ চিন্তা, অসৎপ্রলাপ ও অসৎ কার্য্য সকল স্মরণ করিয়া অশ্রুজলে তর্পণ করি,—কলস কলস জল উৎসর্গ করিয়া পাপ সকলের তর্পণ করি এবং নিত্য অনুসরণকারী প্রেতসকলের হস্ত হইতে বিমুক্ত হই। আজ পাপহারী পরমে-

শ্বরকে স্মরণ করিয়া অশ্রুবারি যিনি যত উৎসর্গ করিতে পারিবেন, তিনি অদ্যকার দিনকে ততই সার্থক করিবেন।

বৎসরান্তে এই বিশেষ দিনে যেমন আমরা পাপ-প্রেতদিগের তর্পণ করিব, সেইরূপ নির্জ্জনে একান্তমনে ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিব। পলকে পলকে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, দিন-রাত্রে সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে,—সংবৎসরে, তিনি যে অবিশ্রান্ত করুণাধারা বর্ষণ করিতেছেন, তাহার কি সংখ্যা ও পরিমাণ হয়? শরীরের প্রতি, আত্মার প্রতি, পরিবার পরিজনের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, এবং সমগ্র জগতের প্রতি তাঁহার করুণা স্মরণ হইলে, "এত দয়া পিতা তোমার ভুলিব কোন্ প্রাণে আর," বলিয়া কোন্ পাষাণ প্রাণ না বিগলিত হয়, এবং কোন কঠোর চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু প্রবাহিত না হয়? বৎসরান্তে দয়াময়ের অপার দয়ার জন্য ভক্তি, শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার চরণ পূজা করিতে পারিলে মানবজীবন ধন্য হয়।

আজিকার রাত্রি অবসান হইলেই নব বর্ষের নব দিনের অভ্যুদয় হইবে। আমরা পুরাতন বর্ষের সহিত যেন পুরাতন পাপ-তাপ, দুঃখ, গ্লানি সকলের বিদায় করিতে পারি। "জের টানিয়া লোকে ফেরে পড়ে" এবং পাপের জের অপেক্ষা সর্ব্বনাশকর ফের আর নাই। আমরা দিনগত ও মাসগত পাপ যদি ক্ষয় করিতে না পারিয়া থাকি, তবে এই বর্ষগত পাপের ক্ষয় না করিয়া যেন ইহাকে বিদায় না দিই। পুরাতন পাপের ভার মস্তকে লইয়া যদি নূতন বর্ষে প্রবেশ করিতে হয়, তাহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি আছে? ঈশ্বরের করুণা ও আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা করিতেছে। কাতরে অকৃত্রিম প্রার্থনা করিলেই যে যাহা চাহিব সে তাহা পাইব, এই সাধুবাক্য বিশ্বাস করিয়া, এস আমরা একান্তভাবে প্রার্থনা করি এবং পুরাতন জীবনের বিনিময়ে নব জীবন লাভ করি। ঈশ্বরের করুণা স্পর্শমণি, লৌহকে স্বর্ণ করিয়া দেয়—পাপকালিমাময় জীবনকে তুষারশুভ্র নব জীবনে পরিবর্ত্তিত করে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

নব জীবনে কি আশার কথা! নব জীবন ঈশ্বরকৃপায় কে কখন পাইবে কে বলিতে পারে! নবজীবনপ্রাপ্ত ব্যক্তির একটী লক্ষণ দেখা যায়। (১) তিনি বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর-পরশে তাঁহার নূতন জন্ম হইয়াছে। (২) ঈশ্বরের শক্তি, তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া, তাঁহাকে ঈশ্বরের দাসত্বে দীক্ষিত করিয়াছে। তিনি আর সংসার-পাপ বা রিপুসকলের দাস নহেন। (৩) কি খাইব, কি পরিব এ চিন্তা তাঁহার থাকে না, তিনি জানেন—ঈশ্বর তাঁহার রক্ষক ও প্রতিপালক। (৪) তিনি সুখ দুঃখ সকল ঘটনায় ঈশ্বরের মঙ্গলহস্ত ও তাঁহার প্রেমলীলা দর্শন করেন। (৫) তিনি সর্ব্বক্ষণ আশাপূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সকল কার্য্যের নিয়ন্তা

জানিয়া তাঁহার সাধু সঙ্কল্প ও সাধু চেষ্টা সফল হইবে, এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ আস্থাবান্। (৬) তিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে ভয়শূন্য, পরম প্রভুর দাস, কাহাকে ভয় করিবেন? মৃত্যুকে দেখিয়াও ডরান না। (৭) তিনি সর্ব্বক্ষণ আনন্দপূর্ণ; তাঁহার পাপ ক্ষমা হইয়াছে, এজন্য তাঁহার আনন্দ; পুনর্জন্ম হইয়াছে, এজন্য আনন্দ, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আপন ইচ্ছা সমর্পণ করিয়া, তাঁহার দাসত্ব করিতেছেন, এজন্য আনন্দ; এবং জগতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে, এজন্য আনন্দ। (৮) সর্ব্বোপরি তিনি প্রেমধনে ধনী। "প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং।" যে প্রেম ক্ষণমাত্র হৃদয়ে আসিলে, বিশ্বসংসার করতলস্থ হয়, সেই প্রেমে প্রেমিক হইয়া, তিনি ঈশ্বরের সহিত রমণ করেন এবং সকল ঈশ্বর-সন্তানকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করেন। ইহার অপেক্ষা উচ্চ অধিকার আর কি আছে? ইহাই জীবের পক্ষে মুক্তি ও পরিত্রাণ।

নবজীবনপ্রাপ্ত মহাজন সকল, এই পৃথিবীতে দেবজীবনের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, জনক, নানক, কবীর, মীরাবাই, বুদ্ধ, চৈতন্য, ঈশা, মহম্মদ, প্রভৃতি সাধুগণ এই অন্ধকারময় পৃথিবীর জ্যোতিঃস্বরূপ। আমাদের ব্রাহ্মসমাজে মহাত্মা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রহ্মভক্তগণ নবজীবনের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাদের জীবনে এবং ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মহিমা উজ্জলরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসক ঈশ্বরদ্বারা আহূত এবং পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের ন্যায় পিতার ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদের অধিকারী। মহাজনদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরা যেন নীচ স্বার্থপর পশু-জীবন পরিহার করিতে পারি এবং নব জীবন, দেবজীবন, লাভ করিয়া তাঁহাদের ন্যায় আমাদের জীবন-চরিত্রেও ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মানবজন্মগ্রহণ ও ব্রহ্মসমাজে আগমন সার্থক হইবে এবং পিতার প্রেমরাজ্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পক্ষে সহায়তা হইবে। আজ এই বিশেষ দিনে সিদ্ধিদাতা পিতা আমাদের জীবনের সহায় হউন।

বঙ্গবিধবার শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে আমরা বিধবাকে কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য ও তাহার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ও তাহার গুণাগুণ বিষয় ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়ো-

জন। (১) সংস্কৃত, (২) বাঙ্গালা, (৩) শিল্প, (৪) গৃহকর্ম্ম, (৫) পরসেবা, ও (৬) ধর্ম্মশিক্ষা, সাধারণতঃ এই কয়েকটী বিষয় একটুকু ভালরূপে শিক্ষা দেওয়াই উচিত।

(১) ও (২) বিদ্যা—সংস্কৃত অতি পবিত্র ও দেবভাষা। উক্ত ভাষা শিক্ষায় মানবহৃদয়ে পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব আনয়ন করে; এবং জ্ঞানতৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং বিধবার পক্ষে সংস্কৃতশিক্ষা অতি উপকারী। সংস্কৃত শিখাইবার ক্ষমতা না হইলেও অন্ততঃ বাঙ্গালাভাষাও ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আরও আমাদের দেশে গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর যে অভাব, তাহাতে একজন রমণীকে ভালরূপে কোনও বিষয় শিক্ষা দিলে, তাহার দ্বারা দেশের অপর দশজন রমণীর উপকার হইতে পারে। বিশেষতঃ দরিদ্রা বিধবাগণ গৃহশিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে অনায়াসে জীবিকার উপায় করিয়া অতি পবিত্র ভাবে দিন যাপন করিতে পারেন।

(৩) "শিল্প।"—শিল্পশিক্ষায় বিধবার বহুল পরিমাণে উপকার সাধিত হয়। আমাদের দেশের এমন অনেক গুলি অপোগণ্ড শিশুর জননী কপর্দ্দকহীনা ভদ্রবংশীয়া অনাথা বিধবা আছেন যে, যাঁহাদের নাকি শিশুসন্তানের হস্ত ধরিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও দিনপাত হয় না; সুতরাং ঐ সকল বিধবাগণের শিল্প-নৈপুণ্য থাকিলে, তদ্দ্বারা জীবিকার উপায় করিয়া লইতে পারেন। সকল শিল্পই যে ব্যয়সাধ্য তাহাও নহে। এমন অনেক শিল্পকাজ আছে, যাহা অতি স্বল্পব্যয়েই হইয়া থাকে, যেমন—কাপড়ের কাজ। কাপড়ের বল, মালা, তোড়া, ফুল, ফল, জীবজন্ত প্রভৃতি। কাগজের উক্ত প্রকারের ফুল, ফল, ঝাড়, মালা, ঠোঙ্গা, ছবি ইত্যাদি। বাঁশের কাজ—বাঁশের চুবড়ী, ফুলের সাজী, কুলা, ডালা, ধুচুনী, বাক্স। বেতের কাজ, বেতের বাক্স, ডালা, সাজি। মাটির দ্রব্যগঠনকার্য্য—মাটির ফল, পুতুল, জীবজন্ত প্রভৃতি। নানা প্রকার পুথির দ্রব্য তৈয়ারি করা, কাপড়ে ফুলতোলা, কাঁথা সেলাই, জামা সেলাই, কুশাসন বোনা। চরকার সুতা কাটা, বস্ত্রবয়ন, বই বাঁধান প্রভৃতি কার্য্যগুলিতে অধিক অর্থাগমের উপায় না হইলেও, যাহা কিছু হয়, তাহাতেই তাঁহারা অন্নচিন্তা হইতে অনেক পরিমাণে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। তদ্ভিন্ন ঐ সকল দ্রব্যের অনেক-গুলিই গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া সংসারের বহুল উপকার সাধন করিয়া থাকে।

(৪) গৃহকার্য্য—শ্রমজনক গৃহকর্ম্মে যেরূপ শরীরের বলবৃদ্ধি, তদনুরূপ মনের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, এবং গৃহস্থালীরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। সুতরাং ধনিগৃহের বিধবা, যাঁহাদের নাকি গৃহকার্য্যের এক-বারেই আবশ্যকতা নাই, তাঁহাদিগেরও কেবলমাত্র শরীররক্ষার্থ প্রতিদিন অন্ততঃ কিয়ৎকালের নিমিত্তও শ্রমকর গৃহকর্ম্মে নিবিষ্ট থাকা প্রয়োজন।

(৫) "ধর্ম্মশিক্ষা—মনুষ্যমাত্রেরই যে,

ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যকতা আছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। যাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা না হইয়াছে, তিনি যাবতীয় বিদ্যার অধিকারী হইলেও তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণই রহিয়া যায়, (অর্থাৎ তিনি কখনই মনুষ্যত্বলাভে সমর্থ হন না); কিন্তু যাঁহার নাকি বিদ্যাবিষয়ক কিংবা অপর কোন শিক্ষাই হয় নাই, তিনিও যদ্যপি ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হন, তবে কেবলমাত্র তাহার বলেই তিনি ধর্ম্মজীবনের সহিত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারেন। ধর্ম্মহীন ব্যক্তিগণ নিজেরাও নির্ম্মল শান্তিসুধাস্বাদনে বঞ্চিত থাকেন এবং অপরকেও তাহা হইতে বঞ্চিত রাখেন। পক্ষান্তরে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তেমনি আবার স্ব স্ব জীবনে যেরূপ বিমলানন্দ ভোগ করিয়া অতুল সুখের অধিকারী হন এবং অপরকেও সেইরূপ আনন্দদানে সুখী করিতে ত্রুটি করেন না। এক দিকে পণ্ডিতাগ্রগণ্য ধর্ম্মহীন আমাদের কবিগুরু মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তাঁহার জীবনব্যাপী ঘোর অশান্তিময় ভীষণ দুঃখের চিত্র, পক্ষান্তরে বর্ণজ্ঞানহীন মূর্খ ধর্ম্মবীর আমাদের রামকৃষ্ণপরমহংস দেব এবং তাঁহার পরমশান্তিময় সাধুজীবনের মধুর সুখের চিত্র, পাঠক পাঠিকাগণ এই দুয়ে মিলাইয়া দেখ। কত প্রভেদ! সুতরাং বিধবাদিগকে সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া একান্ত বিধেয়।

"পরসেবা"—পরসেবা নারীজীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ, কিন্তু ইহাও শিক্ষাসাপেক্ষ। প্রথমে স্বগৃহে ও স্ব স্ব পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের রোগ-ব্যাধিতে সেবাশুশ্রূষা দ্বারা এই শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে হয়। তাহার পরে যখন ক্রমে ক্রমে উহা অভ্যাস হইয়া আসিবে এবং ঐ সকলে দক্ষতা জন্মিবে, তখন ঐ সেবাকার্য্যকে ক্রমশঃ বিস্তৃত করিয়া বিশ্বসেবায় পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু উহা ত পরের কথা, ইহার জন্য অধিক দূরে যাইতে হইবে না। আমাদের এই ম্যালেরিয়া পীড়িত দেশে জ্বরের তো অভাবই নাই, তদ্ভিন্ন ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর সময়ে ঘরে ঘরে এরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়া উঠে যে, সেবা শুশ্রূষা ত দূরের কথা, তৎকালে পীড়িতের মুখে জলবিন্দু দিবার লোক পর্য্যন্ত থাকে না। সুতরাং ঐ সকল সময়ে উপযুক্ত সেবাশুশ্রূষা অভাবে কত লোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার সংখ্যা নাই। তদ্ব্যতীত পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যেও এমন অনেক পুত্র কন্যা ও আত্মীয়স্বজনহীনা অনাথা দুঃস্থা বৃদ্ধা ও যুবতী রমণী আছেন যে, পীড়িতা হইলে সেবাশুশ্রূষার লোকাভাবে তাঁহাদিগের কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকে না। যদি কেহ তখন তাঁহাদিগের সেবা করেন কিংবা মুখে জলবিন্দুও দেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের কত উপকার হয়। বলিতে গেলে জীবন রক্ষা করা হয়। আমাদের ভারতের রমণীরত্ন বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী এবং য়ুরোপীয়া মহিলা সেবাব্রতধারিণী মানবী দেবী ভগিনী ডোরা দৃষ্টান্তস্থল। সেইরূপ পাশ্চাত্য মহিলাগণের মধ্যে এমন শত শত মহিলা আছেন,

যাঁহারা নাকি আজীবন কুমারী থাকিয়া পরসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞান ও ধর্ম্মমূলক শিক্ষা ব্যতিরেকে মানবজীবনে এতাধিক উন্নতি সম্ভবে না। আমাদের বঙ্গবিধবার ভক্তি-বিশ্বাসময় পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যজীবনের সহিত উক্ত জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যা ও পরসেবাময় জীবন মিশ্রিত হইলে, এই দুয়ের সংমিশ্রণে কি মণিকাঞ্চনের যোগ হয় না? দুর্ভাগিনী বঙ্গবিধবার জীবনে কখনও সে শুভদিন আসিবে কি?

ভগিনীগণ! তোমরা তোমাদের এই অকালবৈধব্যের নিমিত্ত আক্ষেপ করিও না; কিংবা ইহার জন্য করুণাময় ভগবানের বিচারে দোষারোপ করিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। ঈশ্বরের মঙ্গল-রাজ্যে জীবের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গলার্থ কোন কার্য্যই সংঘটিত হয় না। তোমাদের এই বালবৈধব্যের মূলেও যে তাঁহার সেই মঙ্গল ইচ্ছাই নিহিত আছে, ইহাই মনে করিয়া তাঁহারই প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিখিও। মানবের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, অর্থাৎ দুঃখের কাল আগত হইলে, জ্ঞানিগণ কদাচ তৎকারণে খেদ করেন না, কিংবা অধীর হন না; অধিকন্তু তাঁহারা করুণাময়ের সকল কার্য্যের মধ্যেই তাঁহারই করুণার হস্ত দেখিতে পাইয়া, তাঁহার প্রতি আরও অধিকতর ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করেন। দেখ, উদ্যানে কত ফুলই ফুটিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কোন ফুলটী ঝরিয়া যায়, কোনটী বা বিলাসীর বিলাস-সেবায় ব্যবহৃত হয়, আবার কোন ফুলটী বা দেবপূজায় উৎসর্গীকৃত হয়। কিন্তু যে ফুলটী দেবপূজায় লাগে, তাহার জন্মই কেবল সার্থক হয়। তোমাদের জীবন তো তাহাই, তোমাদেরও তো কেবল ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধনোদ্দেশেই জন্ম হইয়াছে, ইহাই মনে করিও; সুতরাং তোমরা তোমাদের জীবনকে ব্যর্থ বলিও না। ঈশ্বরের যে অসীম রাজ্যে একগাছি ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত বৃথা সৃষ্ট হয় নাই, ইহা কখনই মনে স্থান দিও না যে, সেই রাজ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী অতবড় একটী মনুষ্যজীবন বৃথা সৃষ্ট হইয়াছে। কেবল খাইয়া পরিয়া পতিপুত্রে বেষ্টিত হইয়া, অহর্নিশ সংসারের ভার মস্তকে বহন করিবার জন্যই নারীজীবন নহে। ভোগে মানবের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, অধিকন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেই থাকে। বস্তুতঃ ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ। প্রবল-সংসারাসক্ত মানব সংসারের চিন্তা ও সংসারের কার্য্য ব্যতীত অপর কাজ ও অপর চিন্তার অবসর পায় না। সুতরাং দয়াময় ভগবান্ যে তোমাদিগকে ঐ আত্মময় সধবাজীবনের অসার কার্য্য ও অসার ভাবনা হইতে মুক্তি দিয়া পরার্থময় এই বৈধব্যের পথে টানিয়া আনিয়াছেন, ইহা ভালই করিয়াছেন। বুঝিয়া দেখিলে, ইহাতে তোমাদিগের আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই, বরং তোমাদের এই জীবনের

গতিপরিবর্ত্তনকে একমাত্র তাঁহারই স্নেহ-দান ভাবিয়া, ইহাই তোমরা সাদরে মস্তকে তুলিয়া লইবে। তোমাদের নিকট কেবল একটীমাত্র নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর সুখের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সেই স্থানে যে তোমাদের জন্য অবিনশ্বর শত শত সুখের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহা কি তোমরা জানিতে পারিতেছ না? সুতরাং ভগিনীগণ! বৃথা আক্ষেপে আর সময় না কাটাইয়া, পরসেবা-ময় দয়ালঙ্কার হৃদয়ে ধারণ করিয়া, কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ কর। দেখিতে পাইবে যে, তোমাদেরও কত কাজ করিবার আছে। ঐ দেখ! দুর্ভিক্ষপীড়িত কত পিতৃমাতৃহীন, অনাথ শিশু রাজপথে পড়িয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে. কত দীন, হীন, অন্ধ, অনাথ, আতুর বালক, বৃদ্ধ রোগশয্যায় পড়িয়া, এক বিন্দু ঔষধপথ্যাভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে, কত স্নেহহীন উপেক্ষিত এবং উৎ-পীড়িত হতভাগ্য ও হতভাগিনীগণ একটু সামান্য মাত্র দয়া ও স্নেহের আশায় করুণ-নেত্রে চাহিয়া আছে, কত শোকার্ত্ত নর-নারী অহোরাত্র, শোকের তীব্রজ্বালায় আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। ইহা-দিগের প্রতি কি তোমাদের কিছুই কর্ত্তব্য নাই? আছে বই কি। যাও! তোমরা ওই অনাথ শিশুগণকে জননীস্নেহে প্রতিপালন কর। ঐ সকল স্নেহহীন পরিত্যক্তদিগকে স্নেহ ও প্রেমবারি বিতরণ কর। আপন বসনাঞ্চলে শোকার্ত্তের নয়নাশ্রু মুছাইয়া তাহাদিগের সান্ত্বনা কর, এবং ঐ সমুদায় রোগপীড়িত অনাথ আতুরের শয্যাপার্শ্বে মাতৃবেশে বসিয়া অহর্নিশ শুশ্রূষা কর! ইহাতে আপনার প্রতি দৃষ্টি করিলে চলিবে না। ঘৃণা করিলে চলিবে না। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বিচার করিলে চলিবে না। দেখিবে, তখন ঐ সকল করিয়া তোমরা হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব সুখ, শান্তি ও বিমলানন্দ পাইবে, সধবা-জীবনের অসংখ্য সুখ, তোমাদিগকে তাহার শতাংশের একাংশও দিতে পারিবে না। তখন তোমাদের হৃদয় হইতে সুখ-দুঃখ সবই এককালে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। সুতরাং তখন আর তোমাদের নিজের বলিয়া কিছুই থাকিবে না। ইহাই পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন, ইহাই মানব জীবনের মহত্ত্ব এবং বিধবাজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ ও চরম উদ্দেশ্য।

কাহাকেও উপদেশ দিতে যাওয়া অথবা অপদস্থ করা, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, এবং আমার ন্যায় জ্ঞানহীনা, ক্ষুদ্র রমনীর পক্ষে তাহা সম্ভবও নহে। এ ক্ষেত্রে কেবল বালিকা ও বয়ঃস্থা বিধবা, এবং তাহাদের অভিভাবকগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে কথঞ্চিৎ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। সুতরাং ঐ সকল বিষয়ের অবতারণা করিতে যাইয়া যদি কিছু অন্যায়ের উল্লেখ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ! এই মূর্খা বঙ্গনারীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। যদি ইহা পাঠে দুর্ভাগিনী বঙ্গবিধবাদিগের মধ্যে, কাহারও বিন্দুমাত্রও উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলে আমার পরিশ্রমকে সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী।

স্বর্গীয়া প্রিয়ম্বদা দেবী

স্বর্গীয়া প্রিয়তমা দেবী।

আমাদের পরমস্নেহাস্পদ শ্রীমান্ শরৎকুমার লাহিড়ীর প্রাণাধিকা কন্যা কল্যাণী প্রিয়তমা দেবী আজি পরলোকগতা বলিয়াই "স্বর্গীয়া" পদবাচ্যা নহে। এ মেয়ে যথার্থই স্বর্গীয় উপাদানে সৃষ্টা। ইহার মুখমণ্ডলে স্বর্গের জ্যোতি, সে জ্যোতি ইহার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব। এমন সুশীলা, এমন কোমল-শান্ত-মধুর-পবিত্র-মূর্ত্তি অল্পই দৃষ্ট হয়। আমি ইহাকে 'মা' বলিতাম বলিয়া প্রাণে শান্তি পাইতাম। ইহার ভগবৎসঙ্গীত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম, শুনিয়া প্রেমোচ্ছলিতহৃদয়ে অশ্রুমোচন করিতাম।

"তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।—"

এ গান আমি বার বার ইহার মুখে শুনিয়াও তৃপ্ত হইতাম না। প্রতিবারেই যেন নূতন বোধ হইত। ঈশ্বরসঙ্গীতকালে স্বয়ং সেই প্রেমানন্দ-জ্যোতিঃ যেন ইহার মধ্যে আবির্ভূত হইতেন! সে দৃশ্য প্রাণান্তে ভুলিবার নয়।

মা! তুমি ঈশ্বরের নিজস্ব সম্পত্তি। ঈশ্বর তোমাকে নিজ কোলে রাখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অথবা দেখিলেন,—এ ত্রিতাপদগ্ধ জ্বালাময় সংসার, এ ত্রিদিব-কুসুমের উপযুক্ত স্থান নহে। তাই তিনি তাড়াতাড়ি তোমাকে কোলে লইলেন। অথবা, আমাদের ন্যায় তিনিও তোমার মুখে ভগবৎসঙ্গীতশ্রবণলালসা সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তুমি আজি আনন্দধামে আনন্দময়ের কোলে বসিয়া, ব্রহ্ম-নামসুধা-বর্ষণ করিতেছ! ব্রহ্মলোকবাসী তোমার পিতামহ (১) প্রভৃতি মুক্তযোগীরা তোমাকে ঘেরিয়া সে সুধা পান করিতেছেন। তবে মা! আর তোমার জন্য কাঁদিব না। তুমি অনন্তকাল এ ঈশ্বরপ্রসাদ ভোগ কর! আমাদের গণ্ডপ্লাবিনী নিঃশব্দ অশ্রুধারাই তোমার স্মৃতিচিহ্ন। ওঁ তৎসৎ।—

শ্রীতারাকুমার।

গত ১০ই ডিসেম্বর, রাত্রি আড়াই ঘটিকার সময়, একটী প্রফুল্ল কুসুম সহসা বৃন্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা, শোভনদর্শনা, শান্তশীলা, প্রিয়তমা দেবী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। উনবিংশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন; এই স্বল্পকালের মধ্যে যিনি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সরল হৃদয়, এবং স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

প্রিয়তমার জীবনীতে কোন ঘটনা-বৈচিত্র্য ছিল না, কিন্তু তাহাতে এমন অনেক জিনিস লিখিবার আছে, যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ

(১) ইহার পিতামহ পুণ্যশ্লোক, বিশ্বপূজ্য রামতনু লাহিড়ী।

লাহিড়ী বংশে প্রথিতযশা, ঋষিকল্প, স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের কন্যা প্রিয়তমা, ১২৯৭ সালের ৯ই আশ্বিন, জন্মগ্রহণ করেন। জেষ্ঠা ভগিনী মনোরমা অপেক্ষা প্রিয়কে ছেলে বেলা হইতেই বড় দেখাইত। পিতামাতা আদর করিয়া কন্যার নাম "প্রিয়তমা" রাখিয়াছিলেন। সত্যসত্যই, যে কতিপয় বৎসর প্রিয়তমা জীবিত ছিলেন, ব্যবহারে, কাজে এবং চরিত্র-মাহাত্ম্যে, তিনি আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেরই প্রিয়তমা হইয়াছিলেন।

শৈশবে গল্প শুনিতে ভালবাসে না, এমন বালক বা বালিকার কথা প্রায় শুনা যায় না। প্রিয়তমা গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। গল্প শুনিতে শুনিতে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যাইতেন। পিতার নিকট, মাতার নিকট, মাতামহীর নিকট বসিয়া গল্প শুনিতেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অযোধ্যারাজমহিষী, শৈব্যা প্রভৃতি রাজেন্দ্রাণীগণের ভাগ্যবিপর্য্যয়, এবং দুঃখদুর্দ্দশার কথা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধা বালিকা কাঁদিয়া আকুল হইত। বাস্তবিক যিনি কাঁদেন তিনি নিজে ত কাঁদেনই, জগৎ-বাসী তাঁহার জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে। কাহারও অত্যধিক সুখের কথা লইয়া কাহাকেও কাঁদিতে দেখিয়াছ কি?. দুঃখের প্রসঙ্গ, চিরকাল মনুষ্যহৃদয়ে সহানুভূতি জাগ্রত করে। প্রিয়তমাও গল্প শুনিয়া কাঁদিত; কিন্তু আবার যখন তাঁহাদের সৌভাগ্যের কথা উঠিত, তখন কি প্রফুল্লমুখে কি আগ্রহে সমগ্র হৃদয় দিয়া বসিয়া শ্রবণ করিত— যেন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি তাহার নিতান্ত আপনার লোক!

দীনদুঃখী দেখিলে, প্রিয়তমা তাহাদের দুঃখবিমোচনে সচেষ্ট হইত। আপনার সামান্য শক্তিতে যতটুকু পারিত, তাহাদের উপকার করিত। বালিকার স্নেহের কথায় পরিতৃপ্ত হইয়া ভিখারিগণ হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যাইত।

কলিকাতা, হ্যারিসন রোড নামক প্রশস্ত রাজবর্ত্মপার্শ্বে, প্রিয়তমার পিত্রালয়। রাজপথ বহিয়া দিবারাত্রি কতলোক গমনাগমন করিত—কত পথিক পথ দিয়া আপন মনে গান করিতে করিতে চলিয়া যাইত, প্রিয়তমা অতি নিবিষ্টচিত্তে সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিত। কখনও আপনার মধুরকণ্ঠে সেই সুরের আবৃত্তি করিত। পিতা বুঝিতে পারিয়া হারমোনিয়ম-পিয়ানো প্রভৃতি কিনিয়া দিলেন, এবং সঙ্গীতবিদ্যা-দক্ষ এক ব্যক্তির হস্তে উভয় কন্যার সঙ্গীতশিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। সুবিধা পাইয়া, প্রিয়তমা সঙ্গীত-বিদ্যার অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব এই ছিল যে, ব্রহ্মসঙ্গীত এবং ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তন ব্যতীত প্রিয়তমা আর কিছুই ভালবাসিত না। উপাসনার প্রারম্ভে যখন প্রিয়তমা ভগবানকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহায়তা ভিক্ষা করিয়া সঙ্গীত করিতেন, মনে হইত এ আহ্বান তাঁহার চরণতলে পৌছিয়াছে। সঙ্গীত

শ্রেষ্ঠ সাধনা,—বোধ হয় এই সাধনায় প্রিয়তমা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

লোকের সহিত ব্যবহারে প্রিয়তমা অনুকরণীয়া। কাহারও প্রাণে ব্যথা লাগিতে পারে, এমন কথা তিনি জানিতেন না। এমন স্নেহপূর্ণ হৃদয়, এমন পবিত্র ভাব, মধুরতাময় সরল সহজ ব্যবহার—এখনকার দিনে বিরল। সহজ কথা একটুকু বাঁকাইয়া বলিলে সরল-হৃদয়া বালিকা বুঝিতে পারিতেন না। সত্যই এ যুগে, এমন সরলতা প্রায় দেখা যায় না।

মিথ্যা কথায় প্রিয়তমা বড় ভয় পাইতেন। কেহ মিথ্যা কথা বলিলে তাঁহার যেন জ্বালা উপস্থিত হইত। মিথ্যাভাষীকে "মিথ্যা কথা আর বলিব না" প্রতিজ্ঞা করাইয়া তবে নিরস্ত হইতেন।

এইরূপে জীবনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল। কিছুদিন বেথুনস্কুলে পাঠ করিয়া, প্রিয়তমা স্কুল পরিত্যাগ করিলেন। ১৯০৬ সনের অক্টোবর মাসে তাঁহার বিবাহ হইল। বরাহনগরনিবাসী, ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শোভনচরিত্র শ্রীমান্ যতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। প্রিয়তমার ব্যবহারে, শ্বশুরালয়ের সকলেই প্রীত ছিলেন। তাঁহার শ্বশুর এবং শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী তাঁহাকে আপনার কন্যা অপেক্ষা অধিক আদর ও স্নেহ করিতেন। কেমন করিয়া লোককে শ্রদ্ধাভক্তি, আদর-যত্ন করিতে হয়, এটি যেন তাঁহার নৈসর্গিক গুণ ছিল। বোধ হয়, সকলের যিনি প্রিয় হন, তিনি ভগবানেরও প্রিয় হন, তাহাতেই বোধ হয়, প্রিয়তমা শীঘ্র শীঘ্র ভবের খেলা সমাপন করিয়া, তাঁহার শ্রীচরণছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

অল্পদিন হইল, প্রিয়তমা স্বামীর সহিত 'ক্রিক রো' নামক ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে, স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত। এই দেহে ১০ই ডিসেম্বর, কি কালব্যাধি প্রবেশ করিল যে, ২৪ ঘণ্টা না হইতেই প্রাণপাখী প্রিয়তমার দেহ-পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া, কোন্ দেশে উড়িয়া গেল। আনন্দপ্রভা স্বর্ণলতিকা ভূতলে পড়িয়া রহিল!

পঞ্চদশমাস-বয়স্ক একটী দুগ্ধপোষ্য শিশুকে অকূল দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, প্রিয়তমা চলিয়া গেলেন। শ্মশানে যখন সেই দেবীপ্রতিমার মুখাবরণ উন্মোচিত হইল, নিকট দাহস্থল যেন আলোকময় হইয়া গেল। দর্শকগণ অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আহা! কার ঘর অন্ধকার করিয়া আসিলি মা! কার সুখের সংসার ছারখার হইয়া গেল?"

যেন হঠাৎ একটা ঝড় উঠিয়া প্রিয়তমাকে উড়াইয়া লইয়া গেল। যাহার কর্ম্ম সমাপন হইয়া গিয়াছে, তাহাকে যাইতে হইবে। প্রিয়তমা কর্ম্ম সমাপন করিয়া রাজরাজের চরণতলে দাঁড়াইবেন বলিয়া, চিরদিন যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। ভগবান্ তাঁহার

আয়োকে আপনার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করুন, তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, জনক, জননী, এবং অন্যান্য আত্মীয়গণকে শান্তি প্রদান করুন, আর তাঁহার প্রাণের পুত্তলীটিকে বহুসুখের অধিকারী করিয়া দীর্ঘজীবন দান করুন নিরন্তর এই প্রার্থনা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক, বি, এ।
৫৭নং হেরিসন রোড,
কলিকাতা।

কাশী-মহিলা-পরিষদ।

বিগত ২৮শে মার্চ্চ, ১৯১০, সোমবার, মহিলাপরিষদের বার্ষিক অধিবেশন মহা-সমারোহের সহিত সমাধা হইয়া গিয়াছে। প্রায় দুই শতের অধিক মহিলা সমুপস্থিতা ছিলেন। তন্মধ্যে হিন্দুরমণীর সংখ্যা অধিক। ইয়োরোপীয় ও খৃষ্টান মহিলাও যোগদান করিয়াছিলেন। ডেরাডুন, লাহোর, বার্হি, বোয়ালিয়া, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে আর্য্যমহিলারা আসিয়া বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী নারায়ণদেবীর অধ্যক্ষতায় সভা আহুত হয়। ডেরাডুন-কন্যাপাঠ-শালার প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস্ জ্যোতিস্বরূপ সভাপতির পদ গ্রহণ করেন ও মিসেস গোটেনদাস্ সহকারী সভাপতি ছিলেন। যথাক্রমে স্ত্রীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, অবরোধ-প্রথা, বিধবাগণের শোচনীয়া অবস্থা, বিবাহে অশ্লীল গীতির কুপ্রথার উচ্ছেদ, বালক-বালিকার অলঙ্কার-ব্যবহার ইত্যাদি প্রস্তাবনা নিম্নলিখিত মহিলাগণের দ্বারা সভায় পঠিত হয়।

মিসেস্ জ্যোতিস্বরূপ, মিসেস্ ওয়াতল, মিসেস্ গোঠনদাস, মিসেস্ নন্দকিশোর, গায়ত্রী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, ইন্দ্রকুঁউর দেবী ইত্যাদি মহিলাগণ যথাশক্তি সুন্দর ও স্পষ্টরূপে নিজ নিজ উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। বলা বাহুল্য যে, বক্তৃতা-সঙ্গীতাদি সমুদায় হিন্দীভাষাতেই হয়। কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দুবালিকা-বিদ্যালয়ের ও ডেরাডুন কন্যাপাঠশালার ছাত্রীগণ সঙ্গীত, সংস্কৃত স্তোত্রাদি দ্বারা শ্রোতৃগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। এই সময়ে কাশী সেণ্ট্রাল বালিকা-স্কুলে একটী শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হয়। তাহাতে অত্রস্থ ও ডেরাডুন এবং বেনারস, সিগরা, সিশল বালিকাস্কুলের বালিকাগণের দ্বারা প্রস্তুত শিল্প রক্ষিত হয়। মহিলাগণের দ্বারা সমাজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংস্কার জন্য যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে নিতান্ত উপ-কারের আশা করা যায়। অবশ্য পুরুষগণ নেতা ও অগ্রণী হইলেও তাঁহারা স্ত্রীশক্তি দ্বারা বল প্রাপ্ত হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। জগদীশ্বর নারীগণের সদুদ্দেশ্য সফল করুন।

নববর্ষ।

১

বর্ষ এলো বর্ষ গেল অনন্ত সাগর-গায়,
শুধু বিরহীর বুকে তারি চিহ্ন থেকে যায়।
শ্মশানে আগুন হায়! সহস্র জিহ্বায় ধায়,
শত অশ্রু ঝরে তাহা নির্ব্বাণ কভু কি হয়?
শুধু বিরহীর বক্ষে তারি চিহ্ন রেখে যায়॥

২

বর্ষ এলো, বর্ষ গেল অনন্ত সাগর-গায়
শুধু বিরহীর ব্যথা নিত্যই যে বেড়ে যায়,
সংসারের কোলাহল, ঢালে শুধু হলাহল,
বক্ষের বিষম ক্ষত নিত্য যে গভীর হয়,
নির্ম্মম সংসার হায়! সে সন্ধান কভু লয়?

৩

বর্ষ এলো বর্ষ গেল, অনন্ত সাগর-গায়।
কত প্রাণ বজ্রাহত কেহ কি সন্ধান লয়?
জলন্ত পাবক ধায়, কত প্রাণ ভস্ম হয়।
বিরহীর ঘোর ব্যথা ভাষায় কি ফুটে হায়!

৪

বর্ষ এলো বর্ষ গেল অনন্ত জলধি-গায়।
বৈতরিণীপারের কিছুই না লক্ষ্য হয়;
উঠিছে কালের ঢেউ, হায়! নাহি গণে কেউ
কত প্রাণ শত খণ্ড তুফানের ঘায়।
বর্ষ যে আঘাত দিল বিরহী কি ভুলে তায়?

৫

বর্ষ এলো বর্ষ গেল, অসীম সাগর-গায়,
কত প্রাণ বজ্রাহত কে তার সন্ধান লয়?
সংসার দুঃখের ঠাঁই তবু তাহা ভুলি ভাই!
জীবনের মহাযুদ্ধে নিত্য যে যেতেই হয়,
অশ্রু মুছি চূর্ণ প্রাণ, ধূলিতে লুটিছে হায়!

৬

বর্ষ এলো বর্ষ গেল অনন্ত সাগর-গায়।
ঘোর ব্যথা বিরহীর কে তার সন্ধান লয়,
সংসারের কোলাহল, কিবা শান্তি দিবে বল,
জীবনের মহাযুদ্ধে নিত্য প্রাণ চূর্ণ হয়,
মৃত কি জীবিত সেই কভু কি মীমাংসা হয়?

স্বর্ণপ্রভা বসু।

LIFE MOTTO.

মরতের ধূলিকণা এ ক্ষুদ্র হৃদয়—
চাহিছে চরণ প্রভু! দাও পদাশ্রয়,
এ মোর সৌভাগ্য কত, সম্মুখে রয়েছ নিত্য,
তাইত দুর্ব্বল হৃদি হতেছে নির্ভয়,
তুমি যদি কর কৃপা কেন এত ভয়?

স্বর্ণপ্রভা বসু।

OTHER REFUGE I HAVE NONE.

সহায় আশ্রয় মম নাহি এ জগতে—
তোমা বিনা, ঢাল সুধা এ দগ্ধ প্রাণেতে।
রাখিবে কি মোরে প্রভো! ও শীতল ছায়,
অথবা ডুবায়ে দিবে নরকের পথে?

পিতা গো ! রেখনা ঘোরে এ মরু প্রান্তরে,
[পা]পরাশি শত শত রহিয়াছে ঘেরে,

হে আশ্রয় মম ! তুমি বিরাজ প্রাণেতে
যাউক এ ভাঙ্গা প্রাণ ও সুগন্ধে মেতে।

ভূত না মানুষ !

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পথিক।

পার্ব্বত্য প্রদেশ।

চারি দিকে গোধূলির মলিনাভা ঘনাইয়া আসিতেছে। সূর্য্য এখনো অস্ত যায় নাই ; অথচ সমস্ত আকাশ দীর্ঘবিলম্বী কৃষ্ণমেঘরাশিতে আবৃত, এবং পর্ব্বতশ্রেণী ও অরণ্য সকল অল্প অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাদেবীর সমাগম হইল ; সন্ধ্যার পুষ্পিত দেহ মৃদুল ও শীতল সমীরে রহিয়া রহিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। শ্যামল তরুচ্ছায় উপবিষ্ট কাল কোকিল তখনও গান করিতেছিল। কোকিলার লীলাময়ী গতির তখনও অবরোধ হয় নাই। বসন্তপ্রফুল্ল পুষ্পপুঞ্জ হইতে উজ্জ্বল অরুণ আভা অনেকক্ষণ সরিয়া গিয়াছে। এতাদৃশ সময়ে করুণরসোচ্ছ্বাসপূত প্রকৃতির পরার্থপরতা কি মধুর !

এই সময়ে পর্ব্বতের নিম্নে গিরিসংলগ্ন অরণ্যভূমির মধ্য দিয়া একজন অশ্বারোহী পথিক বড় ব্যস্তসমস্ত হইয়া যাইতেছিলেন। পথিক অতি সুন্দরকায় যুবা পুরুষ, তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ, আজানুলম্বিত-ভুজদ্বয়, নির্ম্মল ললাটফলক, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, গভীর বদনমণ্ডল ও ধীর কটাক্ষ। এই অল্পবয়সেই এ ব্যক্তি অচল ভগবন্নিষ্ঠা ও সদাচারগুণে অনেক সাধুপুরুষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহার জীবনের লক্ষ্য অতি উচ্চতর ; বিশেষতঃ ইনি আজ পরোপকার-ব্রতে ব্রতী হইয়া একটী জীবনসংশয় কার্য্যে যাত্রা করিয়াছেন। পথিক এক দীর্ঘকায় মহানদীর কূলে আসিয়া, অশ্বের গতি থামাইয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ধ্যাসমীরে নদীর জল হিল্লোলিত হইতেছিল। আজ যেন সান্ধ্য সমীর, চপলা বালিকার ন্যায়, লঘু পদক্ষেপে, কখনও তরুশিরে, কখনও কিশলয়দলে, কখনও কুসুমকুঞ্জে, কখনও বা দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। পথিক সেই উত্তাল-তরঙ্গ-রঙ্গ-পূর্ণ সরিৎসীমাকে শীঘ্র অতিক্রম করিতে চাহিলেন ; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক এক বৃক্ষগাত্রে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। সম্মুখস্থ লতাকুঞ্জ হইতে বিহঙ্গ-

কূজন উত্থিত হইয়া তাঁহার কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করিতেছিল। সহসা কনক-চম্পকসদৃশী গৌরীতুল্যা ত্রয়োদশ বৎসরের একটী সুন্দরী বালিকা শূন্ত পুষ্প-পাত্র হস্তে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সুস্নিগ্ধ নদীকূলে, শীতল সমীরপ্রবাহে, মসীময়ী সন্ধ্যার কিরণে ছোট ছোট বৃক্ষগুলিতে কুন্দফুল ফুটিয়া উঠিতেছিল। ক্ষুদ্র বালিকার সোৎসুক দৃষ্টি সেই ফুলগুলির দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। ক্ষণকাল পরে পথিকের দৃষ্টির সঙ্গে তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। বালিকা পথিককে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল, ও পুষ্পপাত্র ভূমিতে রাখিয়া পথিকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং স্পষ্টস্বরে কহিল—পথিক! তুমি কি পথ ভুলিয়াছ?

শুভ্র চন্দ্রকিরণ-তুল্য বালিকার স্নিগ্ধ রূপে পথিকের দৃষ্টি সংবদ্ধ ছিল, অতএব তিনি কোন কথা কহিলেন না।

বালিকা পুনরায় কহিল, পথিক! তুমি কি পথ ভুলিয়াছ? পথিক সেই অপরূপ স্থানে অপরূপ সুন্দরীর মুখে, অপরূপ প্রশ্ন শুনিয়া অবাক্ হইলেন; ও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বালিকার দৃষ্টি হইতে দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরাইয়া, মৃদুস্বরে কহিলেন, না, পথ ভুলি নাই। এই সময়ে পথিকের চিন্তা অন্য দিকে আকৃষ্ট হইল। সেই নির্ম্মল চন্দ্রালোক-সমুদ্ভাসিত, নানা-পুষ্পসমলঙ্কৃত, গভীর কাননাভ্যন্তরে এমনি একটী বালিকার কথা তাহার স্মরণ হইল। সে এমনই একটী পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, পথিক! তুমি কি পথ ভুলিয়াছ? পরে তাহাদের শুভ সম্মিলন হইয়াছিল। (বালিকার নাম "কপালকুণ্ডলা" ও পথিকের নাম "নবকুমার" ছিল।)

বালিকা পথিককে চিন্তা করিতে দেখিয়া কহিল, হাঁ তুমি পথ ভুলিয়াছ। পথিকের কর্ণে সুধা বর্ষিত হইল, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বালিকে! আমি পথ ভুলি নাই, শীঘ্রই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব, এই জন্যই এই ভয়সঙ্কুল পথে আসিয়াছি।

বালিকা। একেত অন্ধকারময় রজনী, তাহাতে তুমি একা, এ পথে গেলে নিশ্চয় তোমার জীবনসংশয় হইবে। পথিক একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, তা হোক্। বালিকার সুন্দর মুখখানি ঈষৎ মলিন হইল। চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে কাতর হইয়া কহিল,—পথিক! তোমার জীবনে এত বিরাগ কেন? চল তুমি আমাদের ঘরে চল, মা, বাবা তোমাকে কত যত্ন করিবেন। রজনী প্রভাত হইলে নিশ্চিন্তমনে পথে চলিতে পারিবে। রজনীযোগে এই পথে যে কত ভয়ের কারণ আছে, তাহা তুমি সম্যক্ অবগত নহ। এই নদীর সীমা অতিক্রম করিলেই রাস্তার দুই ধারে গভীর অরণ্য, এই সব অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে ভূত বাস করিয়া থাকে।

ভূতের কথা শুনিয়া পথিক একটু হাসিলেন। হাসিয়া কহিলেন, সরলা বালা, তুমি কি ভূত বিশ্বাস কর? ভূতের কথায়

বালিকা একটু ভীতা হইল, কহিল হাঁ বিশ্বাস করি, ভূত না থাকিলে এ সব ভয়াবহ ঘটনা কে ঘটায় ?

পথিক। কি ভয়াবহ ঘটনা ?

বালিকা। শুনিতে পাই সেই সব অরণ্যের ভিতর রজনীযোগে লাল, নীল বাতি প্রজ্বলিত হয়, এবং ঐ অরণ্যের ভিতর অনেক সময় মানুষের রক্তাক্ত মৃত ও অর্দ্ধমৃত দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রজনীতে কোন পথিক ঐ পথে গমন করিলে, ভূত তাহার প্রাণ বিনাশ করে। গভীর রজনীতে কাল রঙ্গের ভূতেরা মানুষ-রূপ ধরিয়া পথে বাহির হয়, এবং হতভাগ্যদিগকে লইয়া অদৃশ্য হয়। তোমরা ভূত বিশ্বাস কর না, কিন্তু ভূত না হইলে কে এ সব কার্য্য করিতে সাহস পায় ?

পথিক। বোধ হয় কোনও নৃশংস ব্যক্তি কর্তৃক ঐ সব কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

বালিকার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইল। সে অঞ্চলে দেহ আবৃত করিয়া কহিল, মানুষ কি মানুষকে মারিতে পারে ?

"পারে না ত কি ?" এই কথা বলিয়া পথিক কিঞ্চিৎ চিন্তাযুক্ত হইলেন। এই সব লোমহর্ষণ ঘটনা কাহার দ্বারা সাধিত হয়, পথিক অন্যমনস্ক হইয়া সেই বিষয়ই চিন্তা করিতেছিলেন।

পথিককে চিন্তা করিতে দেখিয়া বালিকা কহিল,—চল, তুমি আমাদের ঘরে চল, তোমার কোন ভয় নাই; সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রত্যহ পিতা মাতার সঙ্গে আমি এই বনপথে নদীতটে আসিয়া পথিক-দিগের অপেক্ষা করিয়া থাকি। আমার পিতা মাতা কোন পথিককেই, সন্ধ্যার পূর্ব্বে এ পথে যাইতে দেন না, আপন গৃহে আহ্বান করিয়া লইয়া যান, অকপটে রাস্তার বিবরণ তাহাদের নিকট বর্ণনা করেন। পূর্ব্বে অনেক পথিক এ পথে যাতায়াত করিত, কিন্তু এই সব কারণে, এখন এ পথে আর কোন পথিকই যাতায়াত করে না। বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়ে একটী প্রাণীকেও এ পথে দেখা যায় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ আমার পিতা মাতা উভয়েই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ঘরে আছেন। চল, তুমি আমাদের ঘরে চল, তোমাকে দেখিয়া তাঁহারা কত সন্তুষ্ট হইবেন। তুমি একা এ অন্ধকার-রাত্রিতে কখনও এ পথে যাইও না। মানুষে হউক, ভূতে হউক, তোমাকে নিশ্চয় বধ করিবে। বালিকার পিতা মাতার গুণের কথা এবং বালিকার দয়া দেখিয়া, পথিক মুগ্ধ হইলেন। পুনরায় অন্যমনস্ক হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই যে সুমধুর স্বর্ণলতাটী বসন্তের মৃদু সমীরে আমার নয়ন সমক্ষে যেন স্নিগ্ধ মাধুরী-ময়-কনক-তরঙ্গ-সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, এ কে ? দেখিতেছি এই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় মধুর প্রেমসৌন্দর্য্যে সুরঞ্জিত। ইহার কোমল দেহলতা ললিত লাবণ্যের লীলাভূমি বলিয়া অনুভূত হইতেছে। ইহার নামই বা কি ? জাতিই বা কি ? পথিককে নিরুত্তর দেখিয়া

বালিকা কহিল, "আমার বোধ হইতেছে তুমি এখনি আমার সঙ্গে আমার গৃহে যাইবে।" "না আমি তোমার সঙ্গে তোমাদের গৃহে যাইব না—তুমি গৃহে যাও, তোমার কোন ভয় নাই। মানুষ হউক, ভূত হউক, কেহই আমাকে বধ করিতে সাহস করিবে না। কোন শত্রুই আমাকে হত্যা করিতে পারিবে না। বরং আমার তীক্ষ্ণ তরবারিই সমুদয় শত্রু নিপাতে সমর্থ হইবে। আমি যে কার্য্যে যাইতেছি, তাহাতে পথিমধ্যে মুহূর্ত্তবিলম্বও অনিষ্টকর জানিবে।" পথিক এই বলিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক গন্তব্যস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)।

স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য কাজ।

কোন একজন ইউরোপীয় শিক্ষক ছাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার সময় বলেন—প্রফুল্ল থাকা স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ; পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা দ্বিতীয়, এবং রন্ধনে নিপুণ হওয়া তৃতীয় গুণ। বালিকারা উহার বিবৃতি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি এই উত্তর দেন যে, সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিয়া আমোদ আহ্লাদ করা প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য, ফুটন্ত ফুলের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া সংসারকে সুখ-শান্তিময় করা নারীর প্রধান কর্ত্তব্য। আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অর্থ যে, সাবান মাখিয়া কেবল বেশবিন্যাস করা, তাহা নহে; নিজ শরীর ও বস্ত্র হইতে সমস্ত গৃহ একরূপ পরিষ্কার, ধৌত ও সামান্য দ্রব্যে সুন্দর করিয়া সাজানই উহার উদ্দেশ্য। তৃতীয় গুণ—রান্নায় নিপুণতার অর্থ যে কেবল পোলাও, কালিয়া রান্না, তাহা নহে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের যত প্রকার তরিতরকারী, সাক্‌সবজী, ফলমূল আছে, তাহার বিষয় জানা উচিত, তাহা ব্যতীত অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে সুন্দর ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা ও রাঁধাবাড়া দেখা শুনা গৃহিণীর একটা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

প্রাচীন শিক্ষকের ঐ উপদেশটী ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদের ন্যায় বঙ্গনারীদেরও বিশেষ উপকারী। সকল দেশেই স্ত্রীজাতির প্রধান কার্য্যক্ষেত্র নিজ গৃহ, প্রথম কর্ত্তব্য গৃহকর্ম্ম। সেজন্য যাহাতে সেই গৃহকে সুখময় করিতে পারা যায় ও আপনাকে গৃহকর্ম্মে পারদর্শিনী করা যায়, তাহার উপায় জানা প্রত্যেক স্ত্রীলোকের একান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ ইহা সকল মহিলারই স্মরণ রাখা উচিত যে, স্ত্রীলোকেরা নির্দ্দিষ্ট কাজে অবহেলা করিয়া অন্য কোন কাজে পারদর্শিনী হইলে তাহাতে তাহাদের চতুরতার প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহাতে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় না। স্বভাব দ্বারা নির্ণীত স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যে নিপুণ হইয়া তাহার উপর যদি আমরা

আরও কোন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই উহাকে প্রকৃত উন্নতি বলা যাইতে পারে। আমাদিগের মা, দিদিমাদিগের লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি নামের সহিত সুশিক্ষিতা, মার্জিতা পদের যোগ করাই প্রকৃত নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য—ইহা যেন আধুনিক মহিলারা সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন।

মিসেস্ ডি, এন, দাস।

আব্রাহাম লিন্কন্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

সামান্য কুটীরে দিন অতিবাহিত করা যখন কষ্টকর হইয়া উঠিল, তখন আব্রাহামের পিতা একখানি দারুগৃহ নির্ম্মাণ করিবেন মনঃস্থ করিলেন। তাঁহার অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন না ঘটাতে পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও তিনি স্বয়ং গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। আব্রাহাম নানা উপায়ে তাঁহার পিতার সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি বাসগৃহের জন্য কুঠারহস্তে অরণ্যে গমন করিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেন। কাষ্ঠচ্ছেদনকার্য্যে তিনি যেন বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। পরিণত বয়সেও তিনি এ কার্য্য করিতেন শুনা যায়; এবং ইহার দুই একটা প্রমাণও আমরা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিব। পিতা ও পুত্রের সমবেত যত্নে ও পরিশ্রমে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। এই নবনির্ম্মিত গৃহখানি পূর্ব্বের কুটীর অপেক্ষা অনেকাংশে আরামপ্রদ হইয়াছিল। লিন্কন্‌পরিবার এই নূতন গৃহ প্রাপ্ত হইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন।

আব্রাহামের পিতা এরূপ দরিদ্র ছিলেন যে, তাঁহার গৃহমধ্যে কোনও মূল্যবান্ বা সৌখিন দ্রব্য ছিল না, শয়ন করিবার জন্য একখানি অপ্রশস্ত কাষ্ঠখণ্ড মাত্র ছিল। উপযুক্ত বিছানা ছিল না, অনেক সময়ে বৃক্ষের শুষ্ক পত্রই শয্যার কার্য্য করিত। নিদারুণ শীতের সময় পরিবারস্থ সকলেই অতিশয় কষ্টের সহিত রাত্রি যাপন করিতেন। আব্রাহাম লিন্কন্ বাল্যকালে এইরূপ কষ্টে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই ভবিষ্য জীবনে যুক্তরাজ্যের সভাপতি (President) পদ লাভ করিয়াও বিলাসের অস্পৃশ্য ছিলেন। টমাসের গৃহ ধনিজনোচিত সামগ্রীতে সুসজ্জিত না হইলেও স্বাস্থ্যরক্ষার অনুপযোগী ছিল না। পিতা ও পুত্রে স্বহস্তে আপনাদিগের বাসগৃহের চতুর্দ্দিক্ পরিষ্কার করিতেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে নানারূপ শাক এবং তরকারির গাছ রোপণ করিয়াছিলেন, এবং ইহাতে তাঁহাদিগের সংসারের অনেক সাহায্য

হইত। আব্রাহাম কখনও পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার শরীর বিলক্ষণ সবল ছিল। বেতনভোগী লোকদিগের অপেক্ষা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন। তিনি এইরূপ শ্রমশীল ছিলেন বলিয়া প্রতিবেশিগণের কোনও শ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পাদনের আবশ্যক হইলে তাঁহারা তাঁহাকে আগ্রহ সহকারে আহ্বান করিত। তিনিও পরের কার্য্য, আপন কার্য্য জ্ঞানে, বিশেষ যত্নের সহিত সম্পন্ন করিতেন।

ইণ্ডিয়ানার অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। তাহারা অরণ্যে শিকার করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিত। আব্রাহাম লিন্‌কন্ অল্পবয়স্ক হইলেও দেশের অন্যান্য অধিবাসিগণের দৃষ্টান্তে বন্দুক ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিলেন। লক্ষ্যভেদে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। এক দিন তিনি বন্দুক লইয়া এক অরণ্যে প্রবেশ করিয়া একটী বৃহৎ বন্যকুক্কুট শিকার করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল। তিনি সেই শিকার তাঁহার জনক ও জননীর নিকট আনয়ন করিলে তাঁহারাও বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। আব্রাহামের শারীরিক এবং মানসিক বল দর্শন করিয়া তাঁহার জনকজননী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পুত্র উত্তরকালে যুক্তরাজ্যমধ্যে একজন খ্যাতনামা পুরুষ হইবেন।

প্রতিকূল অবস্থা বশতঃ আব্রাহাম লিন্‌কন্ বিদ্যাশিক্ষার পরিবর্ত্তে অধিকাংশ সময়ই শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু অবসর পাইলেই নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির জন্য পুস্তকাদি পাঠে বিরত থাকিতেন না। তাঁহার পাঠের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না; অবকাশ পাইলেই তিনি নিবিষ্টচিত্তে পুস্তক অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। পুস্তকপাঠের ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও অর্থাভাববশতঃ তিনি সকল সময়ে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেন না। সুবিধাক্রমে কাহারও নিকট হইতে কোন পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলে আব্রাহাম তাহা অতিশয় যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তিনি বাল্যাবস্থায় আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে গমন করেন নাই। ইণ্ডিয়ানায় আগমনের দুই বৎসর কাল পরে আব্রাহাম একটী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় নিজ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু অতি অল্প দিবস মাত্র তিনি তথায় গমন করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি নিজেই অনেক সময় বলিতেন যে, বাল্যাবস্থায় তিনি ছয় মাসের অধিক কাল বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন নাই।

এই সময় লিন্‌কন্‌পরিবারের বাসস্থানের নিকট তাঁহাদের পরম আত্মীয় মিষ্টার স্প্যারো, তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং

ডেনিস্ হ্যাঙ্কস্ আসিয়া বাস করিলেন। ডেনিস হ্যাঙ্কস্ সম্পর্কে স্প্যারোর ভাগিনেয়। লিন্‌কন্ ও হ্যাঙ্কসের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল। উভয়ে একই সঙ্গে ক্রীড়া না করিলে, একই সঙ্গে আহার না করিলে, একই সঙ্গে বিদ্যালোচনা না করিলে সুখী হইতেন না। আব্রাহাম লিন্‌কন্ তাঁহার প্রাণদাতা বন্ধু, বিলিগালাহারের অভাবজনিত ক্লেশ, এক্ষণে অনেকটা ভুলিতে পারিয়াছিলেন। টমাসের গৃহে একখানি বাইবেল, একখানি বানান পুস্তক, এবং একখানি নীতিপুস্তক ছিল। উভয় বন্ধুতে অনেকবার পুস্তক তিন খানি পাঠ করিয়াছিলেন। আব্রাহাম মধ্যে মধ্যে বলিতেন যে, ঐ সব পুস্তক আর পড়িতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহার ইচ্ছা, আরও পুস্তক সংগ্রহ করেন, কিন্তু অর্থাভাব হেতু তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব হইয়াছিল। পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করিলে আব্রাহাম ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা ভুলিয়া যাইতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হিসাব রক্ষণাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি ডেনিস্ হ্যাঙ্কসের সহিত মধ্যে মধ্যে এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপে তাঁহারা দুই বন্ধুতে বিদ্যালোচনায় মনের সুখে এবং শান্তিতে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

জগতে চক্রনেমীর ন্যায়, সুখ দুঃখ পরিবর্ত্তনশীল। লিন্‌কন্‌পরিবারে আনন্দের অবসানে এই সময় নিরানন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে চলিল। সহসা এই সময় এক উৎকট রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। কোনও কারণে গাভীর দুগ্ধ বিষময় হইয়াছিল এবং অজ্ঞতা বশতঃ বহুসংখ্যক লোক, সেই দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। ইহাতে দেশবাসিগণ অতিশয় ভীত হইল। অবশেষে একই দিনে মিষ্টার স্প্যারো ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী উক্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন। নিকটে কোনও চিকিৎসক ছিল না। টমাস্ ও তাঁহার পত্নী সর্ব্বদা রোগীদের নিকট থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রোগের কোনও উপশম লক্ষিত হইল না। সেবা শুশ্রূষার সুবিধার জন্য করুণহৃদয়া মিসেস্ লিন্‌কন্ রোগীদ্বয়কে আপন কুটীরে আনয়ন করিতে মনঃস্থ করিলেন। টমাস-পত্নীর এই প্রস্তাব আনন্দের সহিত অনুমোদন করিলেন। মিষ্টার স্প্যারো এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লিন্‌কন্-আবাসে আনা হইল। কিন্তু যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা সত্ত্বেও তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। টমাস, আব্রাহাম এবং ডেনিস্ হ্যাঙ্কসের সাহায্যে যথানিয়মে তাঁহাদের মৃতদেহ কবরে নিহিত করিলেন। কয়েক দিবস পরে সেই উৎকট ব্যাধি আব্রাহামের জননীকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিল। এত দিন যে স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে অসীম স্নেহে এবং যত্নে লালিত হইতেছিলেন, সেই স্নেহময়ী জননীকে আব্রাহাম লিন্‌কন্ এখন জনমের মত হারাইতে চলিলেন।

পুত্র সাধ্যানুসারে জননীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু রোগের কোন উপশম নাই; বরং রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮১৮ খৃঃ অঃ ৫ই অক্টোবর তারিখে স্বামী, পুত্র ও কন্যার সম্মুখে মিসেস লিন্‌কনের জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইল। আব্রাহাম মাতৃহীন হইলেন। সমাধিকার্য্যের জন্য টমাস লিন্‌কন্ আয়োজন করিতে লাগিলেন, এবং স্ত্রীর মৃতদেহ রক্ষার জন্য তিনি স্বহস্তে সিন্দুক নির্ম্মাণ করিলেন। মিষ্টার স্প্যারো ও তাঁহার পত্নীর কবরপার্শ্বে আব্রাহামের জননীর মৃতদেহ সমাহিত হইল। সমাধিকার্য্যের সময় বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান হইয়াছিল কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, মৃতদেহ কবরশায়িত করিবার সময় বাইবেলপাঠ ও উপাসনা হইয়াছিল; কিন্তু আবার কেহ বলেন যে, নীরবে মৃতদেহ কবরশায়িত হইয়াছিল। মৃত সহধর্ম্মিণীর আত্মার সদ্গতির জন্য টমাস লিন্‌কন্ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তাঁহার বাসস্থানের নিকটে কোনও খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক থাকিতেন না। ইণ্ডিয়ানায় উপাসনার সময় মিষ্টার এল্‌কিন্স আচার্য্যের কার্য্যে ব্রতী হইতেন। কিন্তু তাঁহার ও টমাসের বাসস্থানের মধ্যে ব্যবধান অশীতি মাইল হইবে। মিষ্টার এলকিন্স টমাস কর্ত্তৃক তাঁহার গৃহে আগমন করিবার জন্য পত্র দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। পত্রখানি আব্রাহাম লিন্‌কন্ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। পত্রে তাঁহার জননীর ব্যাধির ও মৃত্যুর কথার উল্লেখ ছিল। বালক আব্রাহাম পত্রখানি এরূপ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, যিনিই পাঠ করিয়াছিলেন, তিনিই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তৎকালে লিন্‌কনের প্রতিবেশীদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই লিখিতে পারিত। কাহারও পত্র লিখিবার আবশ্যক হইলে, লিন্‌কন্ তাহা লিখিয়া দিতেন এবং এজন্য তিনি সকলের নিকট বিশিষ্টরূপে আদৃত হইতেন। মিষ্টার এল্‌কিন্স, টমাসের পত্র পাইয়া ইণ্ডিয়ানায় গমন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি আব্রাহামের জননীর প্রেতাত্মার সদ্গতির জন্য উপাসনা করিলেন। এরূপ সুন্দরভাবে উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল যে, সমাগত জনমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মিসেস্ লিন্‌কনের সদ্‌গুণাবলী কীর্ত্তনের সময় এল্‌কিন্সের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দের নয়নে অশ্রুকণা দৃষ্ট হইয়াছিল। আব্রাহাম লিন্‌কন্ উপাসনার সময় অশ্রুপূর্ণনয়নে নীরবে দণ্ডায়মান ছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

নূতন সংবাদ।

১। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নূতন আইন প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল ছাত্র বি, এ, এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কনভোকেশনের দিন সার্টিফিকেট্ লইবার জন্য তথায় উপস্থিত না হইবে, তাহাদিগকে ঐ সার্টিফিকেট্ পরে লইবার জন্য ৫৲ পাঁচ টাকা ফি জমা দিতে হইবে।

২। পাতিয়ালার মহারাজা তাঁহার রাজ্য মধ্যে অষ্টাদশ (১৮) বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক কোনও বালক, কিম্বা বালিকা, মদ, তামাক, চুরট বা অন্য কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করিতে পারিবে না, এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। আদেশ লঙ্ঘনে ১৫ (পঞ্চদশ) দিবসের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইবে। অধিকন্তু অষ্টাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক বালিকার নিকট মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিলেও বিক্রেতার ১ (এক) মাস কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইবে।

৩। মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, মহাশয় পাটনা-জেলাস্থিত দর্শন টোলের উন্নতির জন্য ইহার কর্তৃপক্ষকে ৩০০ (তিনশত) টাকা দান করিয়াছেন।

৪। জর্ম্মাণীর অধীনে "নিউ ব্রিটেন" ও "নিউ আয়র্লণ্ড" নামক দুইটী দ্বীপে পপন নামক এক প্রকার মানুষ বাস করে; ইহারা বহুবিধ সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের লোকের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের লোকের পাণিগ্রহণাদি-কার্য্য হয় না। ইহারা ইহাদিগের শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর সহিত কথা কহে না; এবং পথে ঘাটে সাক্ষাৎ হইলে জামাতা ও শাশুড়ী উভয়েই ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এবং এই দেশের বালিকাদিগের অষ্টম বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই, তাহাদিগকে বাটীর একটী গোলাকার গৃহে রাখিয়া দেওয়া হয়; যাবৎ বিবাহ না হয়, তাবৎ তাহারা এই কুটীর হইতে বাহির হইতে পারে না।

৫। ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশে ভারতের ডাকবিভাগে অধুনা স্বদেশী কাগজ, কলম প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে; এবং কারাগারের ওয়ার্ডারদিগের বিলাতী কাপড়ের পাগড়ীর পরিবর্ত্তে স্বদেশী মান্দ্রাজী কাপড়ের পাগড়ী হইতেছে।

৬। পদ্মানদীতীরে, সারাঘাটে সম্প্রতি বিষম অগ্নিকাণ্ডে রেলগাড়ী, কুলির ঘর এবং সরাব্জীর বাঙ্গালা প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বহু অর্থহানি হইয়াছে।

৭। মাননীয় পণ্ডিত সুন্দরলাল, সি, আই, ই, ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের সাহায্যার্থ "হিন্দুধর্ম্ম বা শাস্ত্রগ্রন্থপ্রকাশ সমিতিতে" ৫০০৲ (পাঁচ শত) টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বামারচনা।

বর্ষ-বিদায়।

বিদায়সঙ্গীত গাইছে প্রকৃতি,
ধ্বনিছে বিষাদে করুণ তান,
ফিরি অবিরত দিক্-পারাপারে
দীর্ঘ বরষ হ'ল অবসান।

চৈত্রসংক্রান্তির বিশদ রজনী
ঐ যে নীরবে মাগিছে বিদায়,
মমতার অশ্রু, বিমল সুহাস
মাথায়ে দিয়েছে ধরার গায়।

কর্ত্তব্য-কলসী বহিয়া নির্ভয়ে
বিধাতার এই রাজ্যের মাঝে,
হে বরষ হে নব! হে পুরাতন!
আসিয়াছিলে বল কোন্ কাযে?

বরষ ধরিয়া হেথা তব সনে
কত পরিচয় হয়েছিল ভাই!
কত সুখ দুঃখ জড়ান তোমাতে
থাকি থাকি প্রাণ কাঁদিছে তাই।

দীর্ঘ দিনগুলি করি অবসান,
ফিরে যাও আজি, নিজ আবাসে।
কত দুরবল অভাগা মানব
বসে আছে হেথা তোমার আশে।

আহা!
কত মর্ম্মভেদী মূক-আর্ত্তনাদ
এ বিশ্ব-বীণায় রাগিণী-তানে
পশে নাকি সেথা সুগভীর মন্ত্রে
তুলিয়ে ঝঙ্কার, দেবের প্রাণে।

ওই যে অদূরে মৃদু সমীরণ
তুলিছে নীরবে বিদায়-স্বর,
প্লাবিছে গগন, মথিয়া পরাণ
আকুল প্রকৃতি, আকুল নর।

হে সুহৃদ! আজি এই অবসরে
বিদায়-সঙ্গীতে ভরিয়ে প্রাণ
শুনেছিলে তুমি নিশা-অবশেষে
ঝরা ফুলটীর যাতনা-গান।

কত অভাগীর হৃদয়-প্রসূন
ঝরে গেছে ওই উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাসে,
মুছাতে বারেক সেই ক্ষতরেখা
চলিলে বুঝি দেবের আবাসে?

যাও বর্ষ! যাও দেবের নিবাসে
প্রফুল্ল হরষে হয়ে নিমগন,
(হেথা) নীরবে কাঁদিবে বঙ্গ অভাগিনী
হারায়ে প্রাণের অমূল্য ধন।

সুখে দুঃখে এবে বাঁধিয়ে হৃদয়,
আজিকে তোমারে বিদায় করি।
বৈশাখী উষায়—এ নব বরষে
সাদরে আবার লইব বরি॥

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

বর্ষের বিদায় উপহার।

হাসি মাখা মুখে এসে কাঁদিয়া বিদায় লও,
কোথা হতে চলে এস.কোথা বা ফিরিয়া যাও?
এসেছিলে যেই দিন সেদিন(ও) এমনি রবি
হেসেছিল পূর্ব্বাকাশে বিকাশি নবীন ছবি।
সে দিন (ও)এমনিকরে পাখী গেয়েছিল গান
নব সহকার পরে তুলিয়া পঞ্চমে তান।
কোয়েলা গাহিয়াছিল নব বসন্তের কথা,
প্রকৃতি ভুলিয়াছিল নীহার-পরশ-ব্যথা।
কত আশা সাধ লয়ে এসেছিলে ধরা-বুকে,
নবীন উৎসাহে মাতি অসীম পুলক-সুখে।
তার পর, পরে পরে ষড় ঋতু গেছে চলে,
ধরণীর রঙ্গভূমে কাল যবনিকা ফেলে,
তুমিও চলেছ আজি চির জনমের তরে,
মিশাইতে মহাকায় অনন্ত জলধিনীরে।
এসেছিলে কারে লয়ে কি ধন ফেলিয়া যাও,
যারেক কি পানে তার নিমিষের তরে চাও?
যে দেশে চলেছ আজি, সে দেশ কোথা না
জানি,
কোন্ জগতের পারে সে তোমার রাজধানী?
কোন্ জলধির তীরে কোন্ নন্দনের ছায়—
অমর সুরভি-স্নাত কোন্ স্বপ্ন নিয়ালায়!
নীরব মন্থর পায়ে আজিকে চলেছে যেথা,
যাইবে কি লয়ে সেথা ধরণীর দুটো কথা?
লবে কি অঞ্চলে ভরি বিদায়ের উপহার,
মরমের শত ছিন্ন আশা নিরাশার ভার?
লইবে কি তারি সাথে দুর্ভর এ প্রাণ মম
যাতনা-অনল তপ্ত সাহারার মরু সম?
লয়ে যাও তারি সনে এই ভগ্নবীণা-তান,
জীবন-বরষ-প্রান্তে হয়েছে যে অবসান।

শ্রীসুকুমারী দেবী

পূজ্যপাদ রমেশচন্দ্র দত্তের স্বর্গারোহণে।

কি শুনিনু হায় হায়! একি অকস্মাৎ!
হা অতুল! কোথা গেলে, প্রাণের স্বদেশ
ফেলে,
দুঃখিনী ভারতে হানি শোক বজ্রাঘাত?
চির ও জীবন তব, উৎসর্গিত ছিল সব,
ভারতের সেবা তরে কোথা তুমি আজ?
বিষাদিত বঙ্গবাসী, শোকের সাগরে ভাসি,
তোমারে সম্মান দিতে ছাড়ে নিজ কাজ।
বিদ্যালয়, কার্য্যালয়, যুবাবৃদ্ধ সমুদায়,
আলোড়িত বঙ্গক্ষেত্র হিতৈষিনিচয়।
সবে জানে মনে মনে, কে বুঝিবে প্রাণপণে
রাখিতে স্বজাতিমান স্বদেশের জয়।
পূর্ণ বক্ষে গাহিবারে, কত বল প্রাণাধারে,
কত স্নেহ স্বজনের ঘুচাতে অভাব,
কি মহৎ, কি উদার, কি প্রশান্ত ব্যবহার,
কি বিশাল হৃদয় যে মধুর স্বভাব!
তোমাতরে হাহা করে,তারা আজি দুঃখভরে,
পীড়িত সবাই হেরে ভারত আঁধার।
তব ইচ্ছা প্রাণময়, শুধু কার্য্য কার্য্যময়,
অপার ক্ষমতা বিধি অর্পিল তোমার,
হে মাতুল পুণ্যখনি, দত্তকুল-চূড়ামণি,
নাই কি আজি গো তুমি আমাদের আর?

কার্য্যান্তরে ঘুরে ঘুরে চির দিন দূরে দূরে
রহিলে. এলে না ঘরে লইতে আরাম,
এবে অর্দ্ধাঙ্গীরে ফেলে, একেবারে চলে গেলে
চির শান্তিময় ধামে লভিতে বিরাম।
তব জ্যেষ্ঠ পত্নুকায়, কি বলে বুঝাব তাঁয়,
দুঃখিনী ভগিনী তব হেরে অন্ধকার,
তুমি যে বংশের সার, হেন রত্ন নাই আর,
বঙ্গলক্ষ্মী মণিহারা বিহনে তোমার।
দুঃখের বারতা প্রাণে, পশে নাই কোন্‌খানে?
অজয় তোমার আজি হ'ল পিতৃহীন,
সযতন ভক্তিহার, পঞ্চকন্যা জামাতায়
এই খেদ, পরিলে না অন্তিমের দিন,
তব স্নেহ শতধারে, অস্থিমজ্জা প্রাণাধারে,
ক্ষরিছে, আমরা আজি স্মরি বার বার,
শিশুকালে কোলে নিয়ে মাতৃসম স্নেহ দিয়ে
বাঁচায়ে রাখিয়াছিলে জীবন আমার,
স্বদেশ স্বপরিবার, তোমার স্নেহের ধার,
কি দিয়ে শোধিবে, শক্তি কি আছে কাহার?
শুধু এই অশ্রুধার বিদায়ের নমস্কার,
লও দেব! দয়া করে আজি সবাকার।

মঙ্গলাচরণ।

বহুদিন পরে আজিকে আবার,
বিশুষ্ক কাননে ফুলের বাহার,
লতা পাতা-গুল্ম হরিত-আকার,
নির্জীব পরাণে জীবন-সঞ্চার,
কাহার অমৃত পরশে আজি?

ছিন্ন তন্ত্রী পুন বাজিল মধুরে,
সাহানা রাগিণী সুমঙ্গল সুরে,
ঘোষিল আজিকে নগরে নগরে,
যুগল মিলন প্রেমপ্রীতিভরে,
উল্লাস উৎসাহে সুখেতে মজি।

পঞ্চদশ দিনে মাঘের তৃতীয়া,
হিমসিক্ত শশী ঢালে স্বর্ণছায়া,
এ দত্ত-আবাস আলোকিতকায়া,
নাচিছে আমোদে মাতিয়া মাতিয়া,
যেন গো স্বর্গ এসেছে ভূমে।

সুকুমার পুত্র পবিত্র অন্তরে,
দাঁড়াও আসিয়ে আনন্দ-দুয়ারে,
দেখ হাত তুলে স্বরগের পিতা,
দিতেছেন দান পুণ্য-বিজড়িতা,
নাহিক তুলনা সংসারধামে॥

অমলা বালিকা করেতে মালিকা,
নীলিম গগনে উদিত চন্দ্রিকা,
বিথারি প্রেমের মোহন কলিকা,
তোমারি ভক্ত তোমারি সাধিকা,
দাঁড়ায়ে তোমারি চরণপাশে।
পাণি তার আজি করহে গ্রহণ,
বিধাতা রচিল এ শুভ লগন,
হাসিছে প্রকৃতি শশী ও তপন,
তারকার দল উজলি ভুবন,
সম্মতি দিতেছে সুখের আশে॥
করে লও তারে জীবনের সাথী,
বৈদেহীর প্রতি যেন রাম রথী,
সুখে দুঃখে সদা বনমাঝে রণে,
অটল প্রেমের অটুট বন্ধনে,
সাধিল দুজনে অপূর্ব্ব রীতি।

বিশ্বমহারাজে নিজে এসে ঘরে,
হাতে হাতে আজি বাঁধি ফুলডোরে,
দেন আশীর্ব্বাদ সোহাগে আদরে,
ফুলটীর মত ফুটি নম্রশিরে,
চাহিয়ে বিভুর চরণ প্রতি ॥

শান্তিহারা।

শান্তি শান্তি করি, ফিরি দ্বারে দ্বারে,
শান্তিময় তুমি আছ কোন্ ঘরে ?
বলে দেও মোরে, আজি দয়া করে,
রেখোনা সংশয়ে, মিনতি আমার।
নিদারুণ ভাবে নিরাশার ব্যথা
দহে প্রতি পায়, যাই যেথা সেথা,
পাছু পাছু ঘুরে, আগুলিয়া মোরে,
পারি না ছাড়াতে কবল তাহার ॥
গৃহ পরিজন, ফেলিয়া অদূরে,
এসেছি প্রকৃতি-সুচারু-নগরে,
তব শ্যাম শোভা কত মনলোভা,
পারে কি জুড়াতে ব্যথিত অন্তরে ?
ভূধরের উচ্চ শিখরে শিখরে,
নবীন নীরদ, প্রফুল্ল অন্তরে,
ঝরে হিমবারি তরুশিরোপরি,
নিদাঘের তাপ তাহে সিক্ত করে ॥
(হায় !) হেন স্নিগ্ধ বাসে তোমারি উদ্দেশে,
ঝরে অশ্রুজল আজি মোহাবেশে,
কর শ্রান্তি দূর ওহে ভরপূর,
দাও হে ! প্রাণের অভাব ঘুচায়ে।
ব্যাকুলতা ঘোর কর নিবারণ,
ওহে দয়াময় সন্তাপহরণ !
অপরাধী আমি জান হৃদি-স্বামী,
দীনহীন বলে ঠেলোনাক পায়ে ॥
সংসার আমারে হানিয়াছে বাণ,
সীমা-অন্ত হীন নাহি পরিমাণ,
বিঁধে রহে বুকে মরিতেছি দুখে ;
এ গুরু বেদনা নিবারি কেমনে ?
দাও দাও বল ওহে শক্তিমান্ !
দুর্ব্বলতা লয়ে নাহি পরিত্রাণ,
সংসার-সংগ্রামে শুধু তব নামে
কর যদি জয়ী অধম সন্তানে।
অভ্যস্ত এ প্রাণ বিফল রোদনে,
বুঝে না অবোধ সহস্র শাসনে,
উন্মত্ত প্রমত্ত খুঁজে হারাধনে,
(আহা) নাহি মানে বাধা শতেক যতনে ॥
হরণ করিয়ে হরিনাম ধর,
মানবের সাথে কি কৌতুক কর !
বুঝি না সে খেলা বলি মহালীলা,
তাই পাই দুঃখ নিদ্রা-জাগরণে।
নিরাশা নিশ্চয়ে বেঁধে দেহ হিয়া
সুদৃঢ় পাষাণে দিয়াছ গাঁথিয়া,
তবু কেন আর করে হাহাকার,
ডুবে আছে যেন কাহার ছলনে ॥
শুনি লোকমুখে কাতরে চাহিলে,
দাও নাকি প্রভু ! ফিরে হাতে তুলে,
বিলাতে করুণা কাতর হও না,:
সেই আশাভরে এসেছি দুয়ারে ॥
চেয়ে দেখ ফিরে ! হ'ওনা বিমুখ,
আমি অভাজন,'বুকভরা দুখ—
তব পায়ে ঢালি হব কৃতাঞ্জলি,
ক্ষমা চাহিতেছি অতি আর্ত্তস্বরে ॥

স্নেহের প্রিয়তমা-বিয়োগে।

লক্ষ্মীসমা প্রিয়তমা কোথা চলে যায়!
পরিয়া সুচারু বাস, চৌদিকে ফুলের হ্রাণ,
সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু অলক্তক পায়,
চির হাস্য বিভাসিত, পূর্ণপ্রেম বিকশিত,
বদনে বিমল জ্যোতি রূপের আভায়,
পবিত্র মাধুরী খেলে চেয়ে থাকি
আঁখি মেলে,
তুমি কি মা! দেববালা এসেছ ধরায়?
রাখিতে নারিল কেহ, ছাড়িলে নশ্বর দেহ
ফুরাইল লীলাখেলা এতই ত্বরায়।
জননীর প্রাণসমা. জনকের প্রিয়তমা,
পতির নয়নতারা তুমি গো হেথায়,
তোমা ছাড়া নহে কভু,কেন গো ছাড়িলে
তবু,
শ্বশুর-আলয়ে আজি যাবে কি মা হায়?
কাঁদাইয়া তাঁর মন, তাঁদের সে প্রিয়ধন,
যায় নিজ নিকেতনে, যাবে না তথায়।
মা, তব তনয় ওই, অমিয় কাঁদিছে. কই—
সাড়া যে দিলে না তুমি চলেছ কোথায়?
ভুলে এত অনুরাগ, এত আদরের ডাক,
তাজিলে জন্মের মত কেন মা সবায়?
কেন এল মহাকাল, ছিন্ন করি মায়াজাল
তোমারে কাড়িয়া নিল হায় হায় হায়!
এই যে কদিন হল, বাদ্য সনে সুবিমল,
ভাবময় ভগবৎ-গীত সমুদয়
শুনায়েছ পুরজনে, যে স্বর রয়েছে মনে,
এই যে কদিন হল, বাদ্য সনে সুবিমল,
সে তান ভাসিছে আজো বাতাসের গায়,
আজো নয়নের আগে সেই মুখখানি জাগে,
ভাবপূর্ণ প্রাণ মন ভক্তিভরে ভায়।
এ হেন আদর্শ বালা, সুন্দর ফুলের ডালা,
না শোভিল বিকশিল এ মরত-বায়,
ত্রিদিবের বালা সেই, চিরানন্দ হেথা নেই,
মরত হইতে তাই ত্বরা করে যায়।
অকপট মন তার,না জানিল দুখভার,
আদরে আদরে গেল সুখের ছায়ায়।
চির ভক্তিমতী মেয়ে, বিভুগুণ গান গেয়ে,
দিয়ে-ভক্তি গুঞ্জনে গেল বিভুপায়,
ধন্য তার আত্মজন! ধন্য তার স্বভবন!
এ পবিত্র প্রিয় ফুল, ফুটেছিল যায়।

১৩১৬ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা।

৭। পদ্য।

৮। বিবিধ।

বিষয় পৃষ্ঠা

৯। সাময়িক প্রসঙ্গ।

১০। নূতন সংবাদ।

১১। গ্রন্থাদি সমালোচনা।

১২। বামারচনা।

১৩ চিত্র।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ১ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।